জুন' ৮৩

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

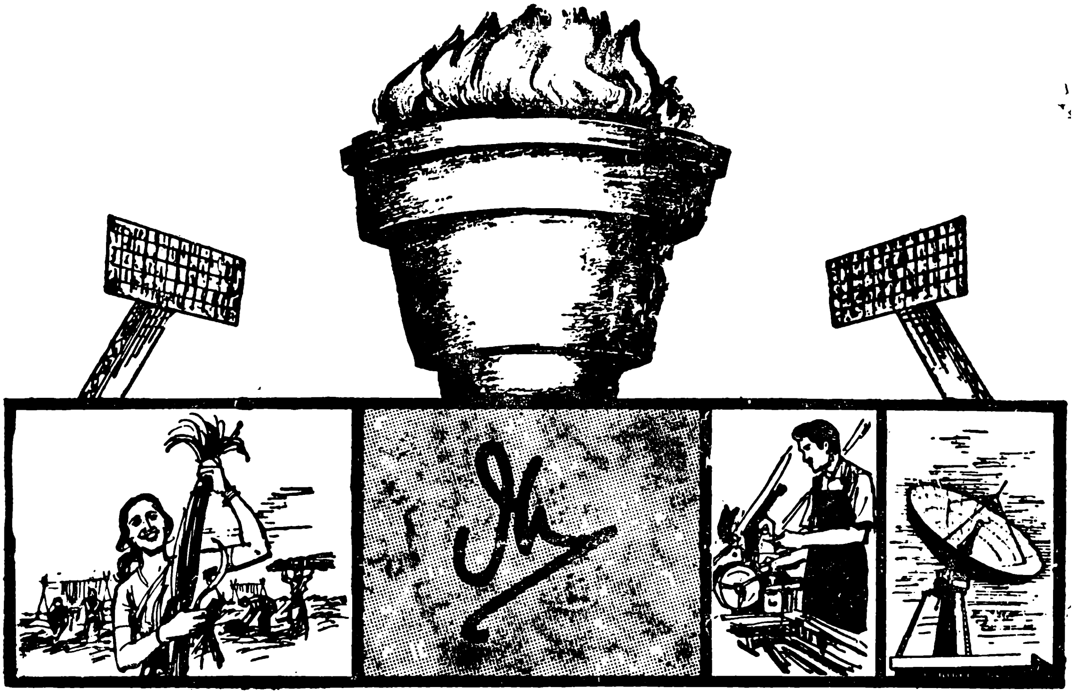

শ্রম এব জয়তে

নবম এশিয়ান গেমস্-এর বিপুল সাফল্যের পেছনে রয়েছে নেতৃত্ব, শৃংখলা এবং কঠোর পরিশ্রম—যা সুবৃহৎ প্রকল্পগুলির দ্রুত রূপায়ণ এবং ভারতের সাংগঠনিক ক্ষমতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং যা ভারতকে বিশ্বজোড়া খ্যাতি এনে দিয়েছে।

স্টেডিয়ামগুলি রেকর্ড সময়ে তৈরী করা হয়েছে। সারা দেশে এবং বিদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ রঙীন টেলিভিশনে সরাসরি খেলা দেখেছেন। এই বিশাল কর্মযজ্ঞে কমপিউটার, ইলেকট্রনিক এক্সচেঞ্জ, মাইক্রোওয়েভ এবং উপগ্রহ সংযোগকে সুষ্ঠু ও দক্ষ ভাবে কাজে লাগানো হয়েছে।

দীপশিখা অনির্বাণ রাখুন

এশিয়াডে যে মনোভাব নিয়ে আমরা কাজ করেছি আসুন জাতীয় প্রয়াসের বৃহত্তর ক্ষেত্রেও আমরা তা ছড়িয়ে দিই।

আমাদের অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য এই গতি অব্যাহত রাখা আমাদের কর্তব্য। আমাদের প্রত্যেককেই এজন্য সচেষ্ট হতে হবে।

শক্তিশালী দেশ গঠনে
আসুন আমরা সকলে মিলেমিশে কাজ করি

davp 82/558

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

3য় বর্ষ 2য় সংখ্যা ॥ জুন, 1983

প্রধান সম্পাদক : সমরজিৎ কর

সম্পাদক : রবীন বল

নতুন বছরের প্রথম সংখ্যা তোমাদের অনেকেরই ভালো লেগেছে জানিয়েছ, এতে আমরা আনন্দিত। পত্রিকার কয়েকটি পাতা রঙিন ছাপা হওয়ায় বেশির ভাগ পাঠকপাঠিকারাই খুশী হয়েছে। তোমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার শরিক আমরাও, কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত সব কিছুকে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয় না নানা অসুবিধায়— এটা আশা করি তোমরা উপলব্ধি করবে। 'নিজে করো' পর্যায়ে তোমরা যেসব মডেলের কথা লিখে পাঠাও, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা কার্যকর হয় না বলে আমাদের কাছে অনুযোগ আসে। এ বিষয়ে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যে মডেলটার কথা লিখে পাঠাচ্ছ সেটা যথার্থই কার্যকর হয় কিনা তা নিজে যাচাই করে তবে লিখে পাঠাবে।

সহ-সম্পাদক : জয়ন্ত দত্ত, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় 1
চিঠিপত্র 2
দপ্তর থেকে
এই পৃথিবীতে 5 জুন ॥ সমরজিৎ কর 3
বিজ্ঞান-সংবাদ ॥ 5
বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প
মহাকাশের দস্যু ॥ অনীশ দেব 21
পড়াশোনা
ধাতুর কথা ॥ অমরনাথ রায় 29
জীবন-বিজ্ঞানের বিচিত্র প্রশ্ন ॥ তারকমোহন দাস 33
ছবিতে গল্প
বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র ॥ দিলীপ দাস 17
খুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 18, 19
জুলভার্নের টোয়েন্টি থাউজেণ্ড লীগস আণ্ডার দি সী ॥
গৌতম কর্মকার : 54, 55
হাবুলের বিজ্ঞানভাবনা ॥ ধীরেন বল 56
পশু পাখি উদ্ভিদ
গ্রেট ইণ্ডিয়ান বাস্টার্ড ॥ অশোক সান্যাল 6
উদ্ভিদের জীবনে আলো ॥ সাধনানন্দ মণ্ডল 35
প্যাঙ্গোলিনের গল্প ॥ পার্থসারথি চক্রবর্তী 8
উপন্যাস
অল ইণ্ডিয়া কমন পিপ্‌লস্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড ॥
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য 9
সবুজ বনের গান ॥ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 37
জ্ঞানবিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা
ম্যাজিক স্কোয়ার ॥ গৌরীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 27
পেট্রোলিয়মের ইতিবৃত্ত ॥ স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায় 13
ভাবনা ॥ অনির্বাণ চক্রবর্তী 16
হাসতে হাসতে ব্যথা সারে ॥ বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী 34
নতুন ধরনের টেলিফোন ॥ নারায়ণ চক্রবর্তী 40
ভাইরাস ॥ অসিতকুমার দাস 41
দাঁত দিয়ে যায় চেনা ॥ সিদ্ধার্থ রায় 42
ফ্লোরেল ও অ্যালুমিনিয়াম পোষাক ॥ কমলকুমার দাস 43
যদি চাঁদ না থাকত ॥ হীরক দাশ 44
জ্ঞানবিজ্ঞানের বিচিত্র সংবাদ ॥ বরুণ মজুমদার 20
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী
কৃতীবিজ্ঞানী মেলভিন কেলভিন ॥ বিবেক রায় 31
ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ॥ শুভঙ্কর 32
নিজে কর
ড্রয়িং ক্যামেরা ॥ সুবীর বিশ্বাস 47
ছড়া
হুলো নিখোঁজ ॥ রাখাল বিশ্বাস 53
ছোটদের দপ্তর
বিজ্ঞানজিজ্ঞাসার উত্তরদাতাদের নাম 45
বিজ্ঞানজিজ্ঞাসা 48
বিজ্ঞানজিজ্ঞাসার উত্তর 48
গাইড মাছ ॥ অনুপম মুখোপাধ্যায় 46
ফেরোমেন ॥ স্বপন ভট্টাচার্য 46
শব্দকূট ॥ স্বাতী রায় 48
সংখ্যাকূটের উত্তর 48
ভেবে ভেবে বল ॥ শুভব্রত রায় চৌধুরী 49
ভেজাল ধরার উপায় ॥ দিব্যদ্যুতি দাস 49
শব্দ ও বিত্ত ॥ বাসুদেব মুখোপাধ্যায় 50
ছায়ামূর্তি ॥ আশীষব্রত ঘোষ 51
কিঞ্চিৎ হলেও নিশ্চিত ॥ আশিস দাস 52

চিঠিপত্র

প্রসঙ্গ ঃ খেলনা ওয়্যারলেস

মার্চ 1983 সংখ্যায় 'নিজে কর' বিভাগে প্রকাশিত দেবাশিষ কর্মকারের 'খেলনা ওয়্যারলেস' সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ অনুযায়ী আমি ওয়্যারলেস সেটটি তৈরী করি। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সেটটি থেকে কোনো সিগন্যাল পাই নি। সারকিটের ছবিটি জনৈক রেডিও-বিশারদকে দেখাই। তিনি বলেন, সারকিটটি ভুল। পরে আরও পরীক্ষা করে আমি একটি নতুন সারকিট তৈরী করতে সক্ষম হই। এই নতুন ওয়্যারলেস সেটের স্পীকারে কথা বললে কাছাকাছি সব রেডিওতে শোনা যাবে। ছবি সহ নতুন সারকিটের বিবরণ নিচে দিলুম।

তাপসতনু বন্দ্যোপাধ্যায়, সেণ্ট এলুইসাস হাইস্কুল, হাওড়া—1

ছবিতে যেভাবে নম্বর দেওয়া আছে সেইভাবেই লাগাতে হবে।

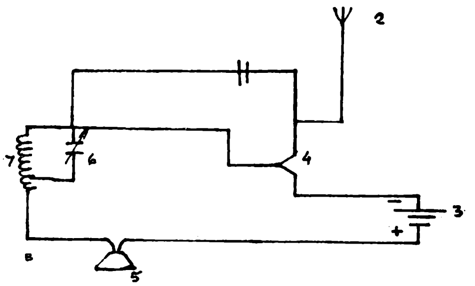

(1) O.1 MFB কণ্ডেন্সার (2) এরিয়েল
(3) 3 ভোল্টের ব্যাটারি
(4) ট্রেনজিস্টার (2N482 অথবা 2SA12 BEL)
(5) একটা ছোট স্পীকার (8-2)
(6) একটি ভেরিয়েবল কণ্ডেন্সার (PVC.2J)
(7) 2x কয়েল ও কিছু তার।

প্রথমে ট্রানজিস্টারের একটি পয়েন্ট থেকে তার নিয়ে ব্যাটারির মাইনাস (—) পয়েন্ট যোগ কর। ট্রানজিস্টারের আর একটা পয়েন্ট থেকে তার নিয়ে এরিয়েলের সঙ্গে যোগ কর। ট্রানজিস্টারের তৃতীয় পয়েন্ট থেকে তার নিয়ে ভেরিয়েবল কণ্ডেন্সারের একটি পয়েন্টের সঙ্গে যুক্ত কর। এবারে ব্যাটারীর প্লাস (+) পয়েন্ট থেকে একটা তার স্পীকার নিয়ে গিয়ে 2x কয়েলের একটি প্রান্তে যুক্ত কর। ভেরিয়েবল কণ্ডেন্সারের দুটি পয়েন্ট কয়েলের সঙ্গে যে-ভাবে ছবিতে দেওয়া আছে সেইভাবে যুক্ত কর। ছবির মতো করে এরিয়েল থেকে একটা তার নিয়ে O·1 MFB কণ্ডেন্সারের একটি পয়েন্ট যুক্ত কর। MFB কণ্ডেন্সারের একটি পয়েন্ট থেকে তার নিয়ে ছবির মতো করে যেখানে কয়েল ও ভেরিয়েবল কণ্ডেন্সারের একটি প্রান্ত যুক্ত হয়েছে, সেইখানে যুক্ত করে দাও। ওয়ারলেস তৈরী হয়ে গেল। এবারে স্পীকারে কথা বল এবং তোমাদের রেডিও সেটটি এডজ্যাস্ট করে নাও। রেডিওতে কথা শোনা যাবে।

প্রসঙ্গ ঃ তাপ

গত ফেব্রুয়ারি 83 সংখ্যায় প্রকাশিত পড়াশোনা বিভাগে আলোক চক্রবর্তী রচিত 'তাপ' প্রসঙ্গটিতে আলোচিত আপেক্ষিক তাপ সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

লেখক আপেক্ষিক তাপের সংজ্ঞায় বলেছেন, 'কোন পদার্থের একক ভরের তাপমাত্রা 1 ডিগ্রী বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন, তাকে ঐ পদার্থের আপেক্ষিক তাপ বলা হয়।'

কিন্তু অন্যান্য পাঠ্যপুস্তকে আমরা দেখেছি, আপেক্ষিক তাপের সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া হয়েছে—'কোন পদার্থের নির্দিষ্ট ভরের নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় তাপ সমভর জলের সমতাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় তাপের যতগুণ সেই তুলনামূলক সংখ্যাটিকে উক্ত পদার্থের আপেক্ষিক তাপ বলে।' আপেক্ষিক তাপ একটি তুলনামূলক সংখ্যা এবং এককবিহীন। এই সংজ্ঞাটি আমার মতে মতে সঙ্গতিপূর্ণ।

কৌশিক সেনাপতি, দুর্গাপুর—10, বর্ধমান।

দুটি সংজ্ঞাই ঠিক। তবে প্রথম সংজ্ঞাটি বর্তমানে প্রচলিত এবং দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি বর্তমানে প্রায় অপ্রচলিত।

অলোক চক্রবর্তী, জয়পুরিয়া কলেজ, কলিকাতা-5

প্রসঙ্গ ঃ জীবনবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ

গত মার্চ 83 সংখ্যায় 24 পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলামের 16/17 লাইনে মুদ্রণ প্রমাদের দরুন কিছু ভুল ছাপা হয়েছে। 'ভ্যাণ্ডা রকসবার্ণী' জায়গায় ভ্যাণ্ডা রকসবার্গী এবং উইলিরাম রকসবার্ণের জায়গায় উঁইলিয়াম রকসবার্গ হবে।

তারকমোহন দাস, 5 বালিগঞ্জ সারকুলার রোড, কলি-19।

প্রসঙ্গ ঃ তাপের যান্ত্রিক তুল্যাংক 'J'

মার্চ 83 সংখ্যায় বিবেক রায়ের রচিত নিবন্ধে J-এর মান দেওয়া হয়েছে $4{\cdot}18 \times 80^7$ আর্গ প্রতি ক্যালোরি। ওটি $4{\cdot}18 \times 10^7$ আর্গ প্রতি ক্যালোরি হবে।

বশীরউদ্দিন, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।

প্রসঙ্গ ঃ জানার কথা

মার্চ 83 সংখ্যায় 'জানার কথা'র লেখকের নাম সুবীরকুমার দাস, কলিকাতা-67 হবে।

দপ্তর থেকে

এই পৃথিবীতে 5 জুন

সমরজিৎ কর

আমরা বলি, সাত সমুদ্র তেরো নদী। রূপকথার গল্পে কতবারই না এমন কথা শুনেছ তোমরা। কিন্তু যখন বড় হলে, ইস্কুলে ভূগোল পড়লে তখন জানলে এ কথা মোটেই ঠিক নয়। পৃথিবীর বুকে সমুদ্র অনেক। নদীও অজস্র। হ্রদও যে কত, তাদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। এ ছাড়া আছে কত পাহাড়পর্বত। সেই পাহাড়পর্বতের ঢালে বা উপতাকায় কত রকমই না বন। কোথাও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে শাল, পাইন। প্যাহাড়ের ঢাল বেয়ে চূড়ার দিকে উঠতে থাক - হিমালয় পর্বতের কথাই ধর—যত উপরে উঠবে, বড় বড় গাছপালা কমতে থাকবে। আর একেবারে শীর্ষে উঠলে, দেখতে পাবে পাথরের বুকে শুয়ে রয়েছে থাকে থাকে গুল্ম অথবা শ্যাওলা। তারপর আর কোন গাছপালা নেই। পাহাড়ের চূড়ায় শুধু বরফ। যতদূর চোখ যায়—শুধু বরফ। কাশ্মীরের খিলানমার্গে গেলে এমন অভিজ্ঞতা অনেকেই পাবে। বরফ আর গাছপালা—প্রকৃতির এক অপূর্ব রূপ! দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। মনটা আনন্দে ভরে ওঠে।

যেমন ধর, ওই হিমালয় পর্বত। তোমরা তো জান, হিমালয়ের বুকে রয়েছে গঙ্গোত্রী হিমবাহ। এই হিমবাহর বরফগলা জলা গঙ্গা নদীর উৎস। রয়েছে যমুনোত্রী হিমবাহ। তার জল সৃষ্টি করেছে যমুনা নদী। বিজ্ঞানীরা ভাবছেন, হয়তো এমন দিন আসিবে যখন ওই সব হিমবাহর অস্তিত্বই আর থাকবে না। তখন গঙ্গা বা যমুনার উৎস-মুখটিই হয়তো যাবে শুকিয়ে। গঙ্গা বা যমুনার বুকে তখন আর জল থাকবে না, থাকবে শুধু শুকনো বালি। আর তাদের দু পাশের সারা অঞ্চলে দেখা দেবে মরুভূমি।

এদিকে ভারতের পশ্চিমে থর মরুভূমিও কিন্তু থেমে নেই। থরের থাবা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র এবং দিল্লীর দিকে।

আমরা যখন ছোট ছিলাম, সন্ধ্যে নামলেই আমরা শুনতে পেতাম শেয়ালের হুক্কাহুয়া। এক একটি প্রহর যায়, আর শুনতে পাই দলবদ্ধ শেয়ালের ডাক। বর্ষা নামলে পুকুর জলা জলে ভরে যায়। তখন দেখতে পেতাম পানকৌড়ির দঙ্গল সেখানে। দেখতে বকের মত। কিন্তু কি মিশকালো চেহারা। একবার করে ডুব দিচ্ছে আবার ভেসে উঠছে। অথবা কালবৈশাখী যখন নামে—সারা আকাশে ঘন কালো মেঘের আস্তরণ। আর সেই আকাশের বুক চিরে উড়ে চলেছে শুভ্র বকের দল। বর্ষায় ব্যাঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ধ্বনি, শীতে তালগাছের ডগায় শঙ্খ চিলের ডাক। তার যেন তুলনা হয় না।

এসব দৃশ্য এখন তেমন আর চোখে পড়ে না। শুধু ভারতেই নয়, পৃথিবীর বহুদেশের মাটি শুকিয়ে যাচ্ছে। বড় বড় বন কেটে তৈরি হয়েছে শহর কারখানা। বহু প্রাণী এখন প্রায় অবলুপ্ত। অবলুপ্ত বহু অঞ্চলের নানা-রকম উদ্ভিদ।

এখন কেউ কেউ এমন কথাও বলছে, অবস্থা যা, হয়তো আর কয়েক বছর চলবে। তারপর পৃথিবীর প্রাকৃতিক চেহারাটাই যাবে পালটে। সাহারা, গোবী, কালাহারী অথবা থর মরুভূমিতে বর্ষায় হয়তো নামবে অতিবর্ষণ। যে সব অঞ্চলে এখন ফসল ফলছে সেখানে গড়ে উঠবে মরু-ভূমি। সমুদ্রের উপকূল অঞ্চলে মাছের ঝাঁক। তখন অনেকেই তারা মারা যাবে। নদীতে এখন এমনিতেই মাছ কমে এসেছে। তখন আরো কমবে। দক্ষিণ মেরুতে রয়েছে পৃথিবীর প্রায় নব্বই ভাগ বরফ। সে বরফ গলে গিয়ে দক্ষিণ মেরুকে করে তুলবে উষর মরুভূমির মতো। আর সেই বরফ গলা জলে সারা পৃথিবীর সমুদ্র ফুলে ফেঁপে উঠে উপকূলবর্তী শহর, বন্দর এবং শিল্পাঞ্চল ডুবিয়ে দেবে। হ্যাঁ, আরো অনেক কথাই বলছেন অনেকে।

হয়তো প্রশ্ন করবে, কারণটা কি?

খুবই সহজ উত্তর। কলকারখানায় পুড়ছে কয়লা এবং খনিজ তেল। ঘরবাড়িতে রান্নার জন্যে আমরা উনুন জ্বালাই, তাতেও পোড়ে কয়লা এবং তেল। পথেঘাটে চলছে মোটরগাড়ি, মোটরগাড়ি থেকেও বেরোয় জ্বালানির জঞ্জাল। এ ছাড়া রান্নাবান্না এবং শীতের সময় ঘর গরম করার জন্যে মানুষ কাঠ পোড়ায়। জন সংখ্যা বাড়ছে। 1900 সালে সারা পৃথিবীর জন সংখ্যা ছিল 150 কোটির মতো। এখন তা দাঁড়িয়েছে 350 কোটিতে। ফলে রান্নার কাঠ কয়লা পুড়ছে আগের তুলনায় আরো বেশি। মানুষের চাহিদা মেটাতে কলকারখানা। সেখানেও জ্বালানির পরিমাণ বাড়ছে। এর ফলে বাতাসে কার্বনডাইঅক্সাইড থেকে শুরু করে কতরকম গ্যাসই না বাড়ছে। বাতাসে অতিরিক্ত কার্বনডাইঅক্সাইড জমার ফলে বাতাসের তাপমাত্রা গত একশ বছরে বেড়েছে প্রায় 4 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মত। কারণ পৃথিবী থেকে যে তাপ বিকীর্ণ হয় তার কিছু অংশ ধরে রাখে এই গ্যাস। এই তাপবৃদ্ধির ফলেই হয়তো পর্বতচূড়ার বরফ একদিন গলবে পুরোটা, গলবে দক্ষিণ এবং উত্তর মেরুতে বরফ।

বাতাসের তাপমাত্রার পরিবর্তনের দরুন আবহাওয়াও পালটাবে। এর ফলে পৃথিবীর ঋতুচক্রে ঘটবে পরিবর্তন। যেখানে বৃষ্টি হয় কম, অথবা মরুভূমি—সেখানে হয়তো দেখা দেবে অতি বৃষ্টি, এতদিন যে সব অঞ্চলে যথেষ্ট বৃষ্টি হত, সেখানে হয়তো দেখা দেবে খরা। এতে চাষবাসের ক্ষতি হবে। বড় বড় বন কেটে মানুষ সংগ্রহ করছে কাঠ। অথচ বনের ওপর আবহাওয়ার সম্পর্ক খুবই নিবিড়। বন থাকলে আশপাশের মাটি থাকে ভেজা। গাছপালা জন্মানোর পক্ষে উপযুক্ত। এ ছাড়া গাছপালা মাটিকে আলগা হতে দেয় না। তাতে ভূমির অবক্ষয় কম হয়। পশুপাখির আশ্রয়ও বনাঞ্চল। বন না থাকলে তারাই বা যাবে কোথায়?

এদিকে অতিরিক্ত ফসল ফলাতে গিয়ে জমিতে ব্যবহার করা হচ্ছে অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার। এই সারের বেশ বড়রকমের অংশ জলের ধোয়ানির সঙ্গে গিয়ে পড়ে নদী নালা, পুকুর, হ্রদ এবং সমুদ্রে। এর ফলে ওই সব জায়গায় জলজ আগাছা বাড়ে। ওই আগাছা জলে মিশে থাকা অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। এতে করে মাছ বা জলজ প্রাণী শ্বসন কাজের মতো উপযুক্ত পরিমাণ অক্সিজেন পায় না—তাদের বাড়বাড়ন্ত কমে।

আরো কতরকমভাবেই না প্রকৃতির ক্ষতি করছে মানুষ! সমুদ্রে চলে তেলচালিত জাহাজ। এখন আবার সমুদ্রের গভীর ভূস্তর থেকে তোলা হচ্ছে পেট্রোলিয়াম এবং জ্বালানি গ্যাস। জাহাজ থেকে পরিত্যক্ত তেল এবং তেল-কূপের চোয়ানি তেল সমুদ্রের বুকে ভেসে বেড়ায়। এর ফলে সামুদ্রিক প্রাণী এবং উদ্ভিদের জীবন বহু অঞ্চলেই এখন বিপর্যস্ত। বড় বড় শহর এবং হাইওয়ে দিয়ে চলছে অজস্র গাড়ি। তাদের শব্দে কত মানুষের কান এখন প্রায় বধির। তাদের পরিত্যক্ত ধোঁয়ায় কত মানুষ ফুসফুসের রোগে ভুগছে। ডি. ডি. টি'র মতো বহু কীটনাশক ওষুধের কবলে পড়ে যে সব কীটপতঙ্গ আমাদের উপকার করে—তারা মারা পড়ছে। বলতে কি এ সব দেখে শুনে শুধু বিজ্ঞানীরাই নয় সাধারণ মানুষও এখন চিন্তিত।

1972 সালে এই সব সমস্যা দূর করার জন্যে স্টকহোমে বসেছিল বিশ্বসম্মেলন। এই সম্মেলন তৈরী করে একটি সংস্থা, যার নাম 'ইউনাইটেড নেশনস এনভাইরনমেন্ট প্রোটেকশন' বা সংক্ষেপে UNEP। বাংলায় বলা যেতে পারে বিশ্বপরিবেশ সংরক্ষণ সংস্থা। এই সংস্থাটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রতি বছর 5 জুন পালন করছেন 'বিশ্বপরিবেশ দিবস।' উদ্দেশ্য পরিবেশ সম্পর্কে সকল মানুষকে সচেতন করে তোলা। মানুষ বুঝুক যে পরিবেশ তাকে বেঁচে থাকার সুযোগ দিয়েছে—সেই পরিবেশের সংরক্ষণের দায়িত্বও তার উপর।

5 জুন তো পড়ল! একটা কাজ কর দেখি। ছোট্ট একটি প্রবন্ধ পাঠাও। ধর, 500 শব্দের মধ্যে। এই প্রবন্ধে তুমি যেখানে বাস কর সেখানকার পরিবেশগত সমস্যার বিবরণ দাও। যার প্রবন্ধ ভাল হবে, তার প্রবন্ধটি 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান'-এ আমরা প্রকাশ করব।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে

সপ্তাহ ব্যাপী পরিবেশ সচেতনতা অনুষ্ঠান

পরিচালনায়ঃ দ্য সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গল

5 জুন '83 ঃ ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও পরিবেশ সংক্রান্ত ভ্রাম্যমাণ বক্তৃতা, সকাল 7 টায় 1 দিনের পরিবেশ সচেতনতা শিক্ষণশিবির যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পোস্টার প্রদর্শনী, বেলা 11 টায়।

6 জুন '83 ঃ 'পরিবেশ ও সমাজ' শীর্ষক আলোচনা—নবারুণ সাহিত্য গোষ্ঠী, বালী, হাওড়া ও 'কিশলয়' সালকিয়া হাওড়া 2 টায়।

7 জুন '83 ঃ 'পরিবেশ ও মানুষ' সেমিনার, ই, জি, ই, বি, মেদিনীপুর।

8 জুন '83 ঃ 'পরিবেশ সচেতনতা গঠনে বিজ্ঞান ক্লাবের ভূমিকা' আলোচনা মুর্শিদাবাদ জেলা বিজ্ঞান পরিষদ—5 টায়।

9 জুন '83 ঃ 'পরিবেশ ও ইকোলজি' সম্পর্কে আলোচনা,. বাসন্তি সিনেমা, টালিগঞ্জ, এস, এ, বি—5 টায়।

10 জুন '83 ঃ 'কেমিক্যাল ও বায়োকেমিক্যাল সলুশন' সিমপোজিয়াম ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ্ কেমিক্যাল বায়োলজি, যাদবপুর—5 টায়।

11 জুন '83 ঃ 'পরিবেশ ও মানুষ' শীর্ষক আলোচনা ও অডিও ভিসিওয়াল লেকচার, বেহালা চিলড্রেন পার্ক—5 টায়।

যোগাযোগ করুনঃ 104, ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলিকাতা-700008 (77-2312)

বিজ্ঞান সংবাদ

বিজ্ঞানে রবীন্দ্র পুরস্কার

এবছর (1983) বিজ্ঞানে রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন বিশিষ্ট ভূ-তত্ত্ববিদ ও বিজ্ঞান-লেখক সঙ্কর্ষণ রায়। যে বইটির জন্যে তাঁকে এই পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে সেটি হচ্ছে 'ভূতাত্ত্বিকের চোখে পশ্চিমবঙ্গ'। তাঁর জন্ম 1928 সালে এবং ভূতত্ত্বে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এস সি।

কৈশোরে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম প্রয়াস। ঘাটশিলার চারপাশে ভূ-বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতে গিয়ে তিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর কাছ থেকে ভূবিজ্ঞান-ভিত্তিক সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা পান। কর্মসূত্রে মাটির একেবারে কাছাকাছি মানুষদের জানবার সুযোগ পান এবং তাদের নিয়ে ছোটগল্প লেখেন। 1952-67 সালে তাঁর রচিত এই সব গল্প শনিবারের চিঠি, কথাসাহিত্য, যুগান্তর, অমৃত ও অন্যান্য পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে পাঠক-মহলে সাড়া জাগায়। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী ও গানের মধ্যে ভূবিজ্ঞানের প্রতিফলন তাঁকে ভূবিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলার ব্যাপারে বিশেষ প্রেরণা দিয়েছিল। পরে তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি কয়েকটি ভ্রমণকাহিনীও লিখেছেন। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে বন্য প্রাণীদের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তিনি এ বিষয়ে এখন লিখছেন। পুরস্কারপ্রাপ্ত তাঁর গ্রন্থটি পশ্চিম বাংলার ভূপ্রকৃতি এবং মাটির নিচে প্রচ্ছন্ন সম্পদ সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলার প্রয়াস। তিনি বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও রম্যরচনার রচয়িতা। আমাদের কিশোর 'জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার তিনি একজন নিয়মিত লেখক।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস

বেহালার দ্য সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে পরিবেশ সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যে 5-12 জুন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এবং বালী, তমলুক, মুর্শিদাবাদ, বেহালা, টালিগঞ্জ ইত্যাদি স্থানে বিবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। কর্মসূচীর মধ্যে আছে ভ্রাম্যমাণ পোস্টার প্রদর্শনী, পরিবেশ দূষণ এবং পরিবেশ ও সমাজ সম্পর্কে লোকরঞ্জক বক্তৃতা ও আলোচনাচক্র, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ইত্যাদি। এই উপলক্ষে একটি স্মারক পত্রিকাও প্রকাশিত হবে।

'বিজ্ঞান এষণা'র বিজ্ঞান আলোচনা প্রতিযোগিতা

গত 30 এপ্রিল শিলিগুড়ির শক্তিগড় বিদ্যাপীঠে 'বিজ্ঞান এষণা'র উদ্যোগে ছাত্রসমাজ তথা জনসাধারণকে সমাজ সচেতন করার উদ্দেশ্যে এক বিজ্ঞান আলোচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'পরিবেশ দূষণ একটি সামাজিক সমস্যা'। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি মহকুমা শাসক এস এ আহমেদ এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রণব চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিমালয়ান স্টাডিজের বিভাগীয় প্রধান ডঃ এস চৌবে। শিলিগুড়ি মহকুমা ও রাজগঞ্জ ব্লকের বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিজ্ঞান ক্লাবসমূহের দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা এই আলোচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে

ভ্রম সংশোধন

1. গত মে 83 সংখ্যায় বিমান বসুর 'রাতের আকাশে তারা' নিবন্ধে 34 পৃষ্ঠায় আকাশের মানচিত্রে অঙ্কনপ্রমাদে পূর্ব ও পশ্চিম দিক উলটো হয়েছে। ডানদিকে পূর্ব এবং বামদিকে পশ্চিম হবে। 35 পৃষ্ঠায় প্রথম স্তম্ভের 23 লাইনে 'তার দূরত্ব হলো প্রায় 10 লক্ষ কোটি' জায়গায় হবে 'প্রায় 41 লক্ষ কোটি (41-এর পরে 12টা শূন্য)। 36 পৃষ্ঠায় প্রথম স্তম্ভের নবম লাইনে 'পূর্ণিমা চাঁদের—1·2', সূর্যের—2·68' জায়গায় হবে 'সূর্যের—26·8'

2. মে 83 সংখ্যায় সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজে'র 'সবুজ বনের গান' কাহিনীতে 51 পৃষ্ঠায় অঙ্কনপ্রমাদে 'ইউনিয়ন জ্যাকে'র পরিবর্তে 'আমেরিকান পতাকা' এবং 52 পৃষ্ঠায় লাইফ বোটের পরিবর্তে 'ভেলা' ছাপা হয়েছে। এজন্যে আমরা দুঃখিত।

— সম্পাদক

গ্রেট ইণ্ডিয়ান বাস্টার্ড

অশোক সান্যাল

গ্রেট ইণ্ডিয়ান বাস্টার্ড ভারতেরই পাখী। ভারত উপমহাদেশ হলো এই পাখীর আদি ঘর। একশো বছর আগেও রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও পশ্চিমবঙ্গের শুষ্ক অঞ্চলে এই পাখীর দেখা মিলত। এরা সংখ্যাতেও ছিল কয়েক হাজার। কিন্তু আজ? পশ্চিমবঙ্গ, বিহার আর তামিলনাড়ু বাদে আগের সব রাজ্যে এই পাখী পাওয়া গেলেও সংখ্যা অনেক কমে গেছে। 1969 সালের এক সমীক্ষায় যেখানে 1260টি পাখীর হিসাব পাওয়া যায়, সেখানে 1978 সালের হিসাবে এই সংখ্যা 745-এ এসে দাঁড়িয়েছে। এই হিসাব দেখে তাই সন্দেহ হয় একদিন হয়তো অতীতের অনেক প্রাণীর মতো এই পাখীও নিঃশেষ হয়ে যাবে।

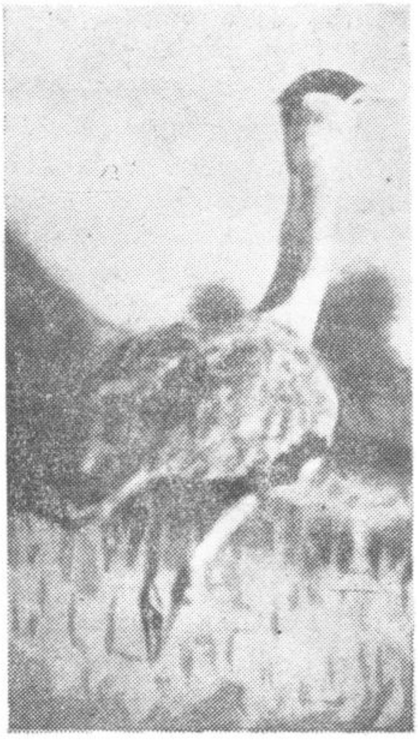

গ্রেট ইণ্ডিয়ান বাস্টার্ড

প্রায় পাঁচকোটি বছরের পুরনো 'ওটিডি' গোত্রভুক্ত এই পাখীর বৈজ্ঞানিক নাম 'কোরিওটিস্ নাইগ্রিসেপস্'। উত্তর ভারতে 'তুকদার হুকনা' নামে পরিচিত। এ গোত্রের অন্য পাখীদের মতো গ্রেট ইণ্ডিয়ান বাস্টার্ডের চেহারা বেশ বড়সড় ও মজবুত। লম্বা গলা আর পা এদের বিশেষত্ব। গলার কিছুটা জায়গা বাদ দিলে শরীরের বাকি অংশ পালকে ঢাকা। ডানা জোড়া বেশ বড় প্রায় শকুনের মতো। নানা রঙে রাঙানো এই পাখীর পুরুষ ও স্ত্রী চেনা যায় রঙ দেখে। পুরুষ পাখীর মাথার ওপরটা কালো, গলা সমেত মাথার বাকি অংশ সাদা পালকে ঢাকা। এর পিঠের পালক গাঢ় কালচে বা পীতাভ আভাযুক্ত মেটে হলদে রঙের। ডানার মাঝের পালকের রঙ গাঢ় ধূসর, পাখার পালক কালচে আর ডগারগুলো সাদা রঙের। লেজের পালক হালকা বাদামীর সঙ্গে ধূসর ছোপযুক্ত। সাদা পালকে ঢাকা শরীরের নিচের অংশে বুকের কাছে আছে এক বন্ধনী কালো রঙের পালক। মেয়ে-পাখীর মাথা ও গলার পালক সাদা। এর মাঝে থাকে কিছু কালো পালকের সারি। এছাড়া মেয়েদের গলার নিচের কালো পালকের সারি পুরুষদের তুলনায় অস্পষ্ট। পুরুষ পাখীরা মেয়েদের তুলনায় উচ্চতায় অনেক বড় আর ওজনেও বেশি। একটা পুরুষ যেখানে প্রায় এক মিটার উঁচু, সেখানে মেয়েরা 70-75 সেমি। পুরুষের ডানা লম্বায় 100-150 সেমি। কিন্তু মেয়ে পাখীর ডানা লম্বায় 60 সে মি-এর বেশি নয়। একটি পূর্ণাঙ্গ পুরুষের ওজন 12-15 কেজি। মেয়েদের ওজন পুরুষের তুলনায় অর্ধেক। চঞ্চু জোড়া লম্বা ও একটু চ্যাপ্টা। কালো রঙের ডগাটা বাদ দিলে পুরোটাই হলুদ। চোখজোড়া হলদে-বাদামী বা পুরোপুরি হলুদ। পুরুষের গলা অপেক্ষাকৃত চওড়া ও চ্যাপ্টা। কিন্তু স্ত্রীর গলা সরু ও গোল। পাগুলি কাঠির মতো সরু।

এদের বাসভূমি হলো মরুপ্রায় অঞ্চল। ঘাস আর ঝোপঝাড়ে ভরা বিশাল উন্মুক্ত ঢিপি বা ক্ষুদে পাহাড় এদের খুব পছন্দ। ধারেকাছে যদি চাষবাস হয় আর ছোটখাটো জলাশয় থাকে তা হলে তো আরো ভাল।

দেখতে বড়সড় হলে কি হবে স্বভাবে এরা বড্ড লাজুক ও সাবধানী। একটু ভীতুও বলা যায়। তবে ভীতু হলেও দল বেঁধে ঘোরে না। প্রজনন ঋতুতে তিন চারটে যুবতী পাখীকে নিয়ে একটা পুরুষ বেশ সুখেই দিন কাটায়। তবে সব পুরুষের কপালে কি আর এই সুখ জোটে? না। অনেককে তাই একা একাই ঘুরতে হয়। অনেক সময় এরকম দু-তিনটে হতভাগ্য পাখী দল বাঁধে আর বোধহয় একে অপরকে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে দিন কাটায়। বছরের অন্য সময়ে মেয়ে-পুরুষ আলাদা বাস করে। একেক দলে থাকে দু-তিনটে মেয়ে বা পুরুষ

পাখী। কখনো আবার বড় দল বেঁধেও ঘুরে বেড়ায়।

পুরোপুরি যাযাবর পাখী না হলেও এরা বছরে অন্তত একবার মনের মতো খাবারের খোঁজে বাসভূমি ছেড়ে ধারে কাছে কোথাও চলে যায়। আবার ফিরে আসে প্রজনন ঋতুতে। তাই এদের পাকাপোক্ত বাসা বলতে কিছু নেই। গরমের দিন কাটে ঘাস বা ঝোপের ছায়ায়। আবার শত্রুর নজর এড়াওেত ঐ ঝোপের আড়াল। তবে ডিম-বাচ্চার কথা ভেবে ছোটখাটো একটা বাসা বানাতে হয় বৈকি। এই বাসা গড়ার পুরো দায়িত্ব মায়ের। বাবা পাখীর কাজই হলো খাওয়া, বান্ধবীর সঙ্গে আনন্দ করা আর টৈ-টৈ করে ঘুরে বেড়ানো। ডিম পাড়ার আগে মা-পাখী কোন ঝোপের তলায় একটা ছোট গর্ত পছন্দ করে। এই গর্তের ভিতরটা কখনো থাকে ঘাসে ঢাকা আবার কখনো বা ফাঁকা।

এই পাখীর খাবারদাবারে কোন বাছবিচার নেই। আমিষের ভিতর সবচেয়ে পছন্দ পঙ্গপাল আর গুবরে পোকা। এছাড়া এই তালিকায় আছে নানা ধরনের পোকা, বিছা, টিকটিকি ও সাপ। স্তন্যপায়ী প্রাণীর ভিতর ইঁদুরও বাদ যায় না। নিরামিষ খাবারের তালিকায় আছে কচিপাতা, দানাশস্য ও বিচিওয়ালা ফল, যেমন কুল। খাবার খেয়ে জল না খেলেও চলে। শুষ্ক অঞ্চলের পাখী হওয়ায় জল না খেয়ে থাকার অভ্যাস এদের আছে। যা পায় তাই খায় গোছের হলেও যখন খুশী তখন খায় ধরনের পাখী এরা নয়। দিনে সাধারণত দু'বার খায়। একবার ভোরে আরেকবার সন্ধ্যাবেলা।

রঙের বাহার থাকলেও কিন্নরকণ্ঠী নয়। সাধারণত চুপচাপই থাকে। তবে ভয় পেলে সবাই মিলে হিস্ হিস্ শব্দ করে। প্রজনন ঋতুতে পুরুষ পাখী 'উ -উম' 'উ -উম' শব্দে মিলন প্রয়াসী সঙ্গিনীকে ডাকে। ঐ ডাক কয়েক মাইল দূর থেকেও শোনা যায়।

বড় একজোড়া ডানা থাকলেও কখনো বলা যাবে না যে এই পাখী ভাল উড়তে পারে। উড়ন্ত পাখী হতে হলে শুধু ডানাই তো সব নয়! আরো কিছু থাকতে হবে। যেমন, হালকা শরীর। দরকার হলে উড়োজাহাজের মতো কিছুটা দূর দৌড়াবার পর ডানা জোড়া মেলে দেয়। তারপর ডানা ঝাপটে আস্তে আস্তে উপরে উঠে উড়ে চলে। মাটি থেকে 10-12 মিটারের বেশি উঠতে পারে না। আর একটানা 3-4 কিমির বেশি উড়তেও অক্ষম।

এরা বছরে একবার ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার সময়ের হেরফের হলেও সাধারণত বর্ষার ঠিক আগে ডিম-বাচ্চার জন্যে বাসা বানিয়ে সেখানে একটা ডিম পাড়ে। ডিমের রং হালকা বাদামী বা লালচে-বাদামী। প্রতিটি ডিম লম্বায় গড়ে 8-9 সেমি ও চওড়ায় গড়ে 6-7 সেমি। ডিম পাড়ার পর মা-পাখী 20-22 দিন ধরে তা দেওয়ার পর ডিম ফুটে যখন বাচ্চা বেরোয়, তখন বর্ষার জল পেয়ে চারপাশের ঝোপ জঙ্গল বেশ সতেজ হয়ে ওঠে। ফলে বাচ্চার জন্যে খাবার জোগাড় করতে কোন অসুবিধা হয় না। পক্ষীবিশারদ ডঃ সালিম আলীর মতে ডিম থেকে বাচ্চা বেরোতে প্রায় চল্লিশ দিন সময় লাগে। এদের আয়ুষ্কাল নিয়ে অনেক মতভেদ। ডঃ আলীর ধারণা 16-24 বছর এরা বাঁচে। বন্দী অবস্থায় রেখে দেখা গেছে, 30 বছরের বেশি বাঁচানো যায় না।

এখন প্রশ্ন হলো, যে পাখীকে একদিন সচরাচর দেখা যেত আজ তার বংশ বিলুপ্ত হতে চলেছে কেন? প্রশ্নটা বড্ড জটিল! তবুও দেখা যাক না কি কারণ? কোন প্রাণীর অবলুপ্তির পিছনে প্রথম কারণ হলো, শত্রুর কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করার ব্যাপারে অক্ষমতা। তা হলে গ্রেট ইণ্ডিয়ান বাস্টার্ডের শত্রু কে? মানুষ! নিছক শিকারের নেশায় বা খাবার হিসাবে ব্যবহারের জন্যে মানুষ হয়েছে এদের প্রধান শত্রু। সম্রাট বাবরের এক লেখায় এই পাখীর প্রশংসা দেখা যায়। কেন? এদের পা আর বুকের মাংস খেতে নাকি দারুন সুস্বাদু। দ্বিতীয় কারণ হলো, বাসযোগ্য জায়গার অভাব। মানুষ তার অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়াচ্ছে। ফলে হাত পড়ছে এই পাখীর বাসভূমিতে।

গ্রেট ইণ্ডিয়ান বাস্টার্ডের সংখ্যা হ্রাস রোধের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্যে ভারতে ইতিমধ্যে কতকগুলি আইনব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই পাখীকে ভারতীয় বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইনের মাধ্যমে সুরক্ষিত করা হয়েছে। এই পাখী ধরা, এদের হত্যা করা ও বিদেশে চালান দেওয়া অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন রাজ্য সরকার এদের সুরক্ষার জন্যে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে অগ্রণী রাজ্য হলো রাজস্থান। 1982 সালে রাজস্থান সরকার গ্রেট ইণ্ডিয়ান বাস্টার্ডকে 'রাজস্থানের পাখী' হিসাবে ঘোষণা করেছেন। এই পাখীকে সুরক্ষার জন্যে রাজস্থান সরকার একটি অভয়ারণ্যও তৈরী করেছেন। তবে কোন প্রাণীর সুরক্ষার জন্যে সরকারী বিধিনিষেধে তুলনায় জনজাগরণের ভূমিকা অনেক বেশি। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত প্রকৃতিকে ভালবাসা, তাকে জানা ও তার অমূল্য সম্পদ সুরক্ষার ব্যবস্থা করা।

প্যাঙ্গোলিনের গল্প

পার্থসারথি চক্রবর্তী

পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে কত বিচিত্র সব প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছে। তারা অনেকেই অবশ্য এখন আর নেই—হারিয়ে গেছে, শুধু রেখে গেছে কালের বুকে তাদের ফসিলের পদচিহ্ন। এইরকম অনেক প্রাণীর নাম তোমরা শুনেছ। যেমন ডাইনোসর, ম্যামথ, ক্যাপুচিন ইত্যাদি। প্যাঙ্গোলিনও ভারী মজার প্রাণী। এদের বংশধারা অবশ্য এখনও পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ লোপ পায় নি, তবে বলা চলে এরাও প্রায় অবলুপ্তির পথে।

আমাদের দেশে হিমালয়ের দক্ষিণে পাহাড়ের ঢালু অংশে জলপাই রংয়ের কিছু প্যাঙ্গোলিন চোখে পড়ে। এ ছাড়া সিংহল, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকা, চীন ও ফরমোসায় প্যাঙ্গোলিন দেখতে পাওয়া যায়।

প্যাঙ্গোলিন স্তন্যপায়ী জীব। এরা লম্বায় প্রায় এক মিটার পর্যন্ত হতে পারে। এঁদের দেখতে অনেকটা বড় 'গিরগিটির মতো'। তলপেট ও পায়ের ভিতরের অংশটুকু ছাড়া প্যাঙ্গোলিনের দেহের সারা অংশ বর্মাকৃতি চামড়ার কঠিন আবরণে ঢাকা। লম্বা, অপ্রশস্ত চিবুক ও নাক, দন্তহীন মুখ এবং বাইরে দীর্ঘ প্রসারিত করবার মতো উপযুক্ত জিভ থাকার ফলে এরা সহজেই পিঁপড়ে ধরে খেতে পারে।

প্যাঙ্গোলিনের পায়ের থাবায় পাঁচটা করে আঙুল আছে। এর মধ্যে সামনের পায়ের দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ আঙুল অস্বাভাবিক লম্বা হওয়ায় তার সাহায্যে এরা বড় বড় পাহাড়ে পিঁপড়ে সহজেই ধরতে পারে।

প্যাঙ্গোলিন নিশাচর জীব। একটু অন্ধকার হলেই এরা বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ে। দিনের বেলায় এরা পাহাড়ের আড়ালে অথবা নিজেদের তৈরী গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। মাটি বিশেষে গর্তগুলো পাঁচ থেকে কুড়ি ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। গর্তের মধ্যে থাকার সময় এরা উপরের প্রবেশপথ বন্ধ করে দিয়ে মাথাটা সামনের পায়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিব্যি আরামে ঘুমায়।

পা দুটো অসম্ভব ছোট বলে এরা খুব আস্তে আস্তে হাঁটে। এদের চলার ভঙ্গীটিও কদর্য। অন্য অনেক স্তন্যপায়ী জীবের মতো এরা চলার সময় মাঝে মাঝে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে সমস্ত দেহটা সোজা করে তুলে চারপাশে ভালো করে নজর বুলিয়ে নেয়।

প্যাঙ্গোলিন তার পায়ের শক্ত বাঁকানো নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ে পিঁপড়ে, ডিম ইত্যাদি খায়। চোখের নিমেষে এত তাড়াতাড়ি এরা তাদের আঠালো জিভ দিয়ে পিঁপড়ে ধরে সাবাড় করে যে অবাক হয়ে যেতে হয়। পিঁপড়ে এদের প্রিয়খাদ্য হলেও অনেক সময় এরা দুধ, সাবু, পচা-ডিম, কাস্টার্ড ইত্যাদিও পছন্দ করে। প্যাঙ্গোলিনের ঘ্রাণ-শক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণশক্তি বেশ প্রখর। ভয় পেলে এরা নিজের শরীরকে একটা বলের মতো গুটিয়ে নিতে পারে। এরা হিংস্র নয়, তবে ধরে ফেললে ল্যাজের ঝাপটা মারে। তাতে অনেক সময় শরীরে মারাত্মক ঘা হয়ে থাকে।

প্যাঙ্গোলিন যে কখন বাচ্চা পাড়ে তা জানা যায় না। তবে দক্ষিণ ভারতে জানুয়ারী থেকে মার্চের মধ্যে এদের বাচ্চা ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে। জন্মাবার মাত্র পরের দিনই বাচ্চার দেহের উপরের নরম অংশ কঠিন আকার ধারণ করে। বাচ্চা বেড়ে ওঠেও খুব তাড়াতাড়ি। মা-প্যাঙ্গোলিন বেড়ানোর সময় তার বাচ্চাকে লেজের পিছনের উপর নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। অবশ্য ধারেকাছে শত্রুর আভাস পেলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিজের শরীরের নিচে লুকিয়ে ফেলে। অনেকে বিশ্বাস করে প্যাঙ্গোলিনের দেহের শক্ত অংশ কেটে আংটির মতো আঙুলে পরলে বাত সেরে যায়।

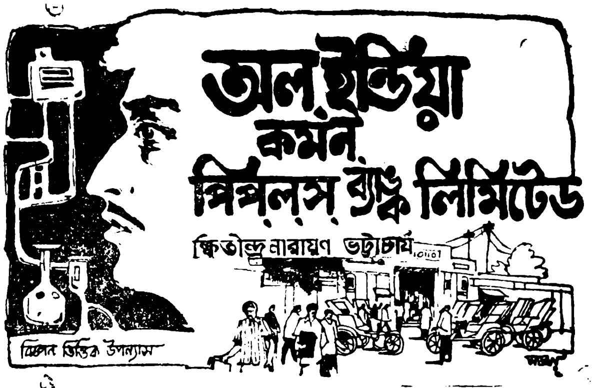

আগে যা ঘটেছে

রহস্যময়ভাবে মফস্বল শহরের একটি ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়ে গেল। যে ব্যাঙ্কে সদ্য ম্যানেজারের চাকরী নিয়ে এসেছে সুশান্ত। কোন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার না করে, ব্যাঙ্কের তালা না ভেঙে স্ট্রংরুম থেকে ডাকাতি হয়ে গেল বহু টাকা। স্ট্রংরুমের তালা খুলতে হলে তো দুটো চাবির প্রয়োজন হয়—যার একটা থাকে ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ারের কাছে, আর একটা সুশান্তর নিজের কাছে। তা হ'লে ডাকাতেরা তালা খুলল কি করে? একটু পরেই এল পুলিশ। সকলের জবানবন্দী নেওয়া হল। কলকাতা থেকে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ও একজন ডিরেক্টর এলেন। ব্যাঙ্কের সব কর্মচারীই দোষ চাপাল সুশান্তর উপরে। সুশান্ত ভীষণ ভেঙে পড়ল। অবশেষে তার বাবার বন্ধু সতীনাথ বাবুকে কলকাতায় চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠাল। সতীনাথ বাবু—ডিটেকটিভই শুধু নন, বড় বৈজ্ঞানিক। ব্যাঙ্ক সুশান্তকে সাসপেণ্ড করল। এর মধ্যেই কলকাতা থেকে এলেন নতুন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার মিঃ কে. সি. ত্রিবেদী।

সতীনাথবাবু হঠাৎই এসে সুশান্তকে যে জিনিস দেখালেন, তাতে সুশান্তর চিন্তা আরও বেড়ে গেছে। স্ট্রংরুমের আলমারীতে যে ছাপ পাওয়া গেছে, তা মানুষের হাতের ছাপ নয়—বানর জাতীয় কোন প্রাণীর।

সতীনাথ বাবু পুলিশের বড়কর্তার কাছে এসে তাঁকে ছোট্ট একটা জিনিসের ফিঙ্গার প্রিণ্ট করে দিতে বললেন। ফিঙ্গার প্রিণ্টটা কিছুটা নতুন খবর এনে দিয়েছে। কলকাতায় ফিরবার আগে মিঃ ত্রিবেদীর বাড়িতে গেলেন। কলকাতা থেকে সতীনাথ বাবু ফিরলেন পুলিশের এস পি এবং ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর মিঃ সেনকে সঙ্গে নিয়ে। সুশান্ত ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারল না। এস পি জানালেন সত্যিকার অপরাধীরা ধরা পড়েছে এবং শেষ পর্যন্ত স্বীকারও করেছে। থানার একটি সুরক্ষিত ঘরে তিনজন অপরাধীকে দেখে সুশান্ত হতভম্ব হয়ে গেল।

॥ ষোল ॥

সুশান্তর বিস্মিত দৃষ্টি লক্ষ্য করে এস. পি. মিঃ বাজপেয়ী বললেন, 'চলুন, আমরা অফিসে ঘরে গিয়ে বসি।'

সতীনাথ বাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'না থাক, আমি ওঁকে নিয়ে একটু বেরুব। দুপুরবেলা যদি ফিরতে না পারি তা হলে যেখানে হোক দু'টি খেয়ে নিয়ে বিকেলে সার্কিট হাউসে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করব। আপনি তো বোধ হয় আজই সদরে ফিরে যাবেন? কখন রওনা হবেন? আমারও একবার যাওয়া দরকার। তবে আপনার সঙ্গেই যেতে পারব না বোধ হয়। কাল যাবার চেষ্টা করব। বলেই সুশান্তকে ইশারায় তাঁর সঙ্গে আসতে বলে তিনি আর বাক্যব্যায় না করে দরজার দিকে এগিয়ে এলেন—মিঃ বাজপেয়ীর জবাব শোনবার জন্য অপেক্ষা না করেই।

রাস্তায় বেরিয়ে সতীনাথ বাবু বললেন, 'বেলা বাড়ছে। এখন আর বাইরে টো টো না করে, চল সোজা তোমার বাড়ির দিকে। ওখানেই স্নানাহার করে নেওয়া যাবে। তার পর যে সব কথা শোনবার জন্যে তুমি নিশ্চয় উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছ সেগুলি তোমাকে দুপুরে রসিয়ে রসিয়ে শোনানো যাবে; কেমন?'

'কিন্তু কাকা—,

'না না, এখন কোন কথা নয়' স্রেফ্ বাড়ির দিকে চল। ভালো কথা, ব্যাঙ্কে কি কাজে যাচ্ছিলে না? টাকা তুলতে বোধ হয়? সেটা তো হল না! থাক গে, এখন আর ওখানে না যাওয়াই ভালো। কাল বরঞ্চ যেও। টাকার দরকার থাকলে আমি বরঞ্চ দিয়ে দেব।'

'না একেবারে সে অবস্থা নয়, কিন্তু—'

'আবার কিন্তু!' সতীনাথ বাবু এবার কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বললেন, 'না আর কোন কিন্তু নয়। যা বলবার দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর। এখন এই—ওয়ান্ টু থ্রী' বলেই তিনি ডানহাতের তর্জনীটা ঠোঁটের উপর চেপে ধরলেন।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর পাশাপাশি দু'খানা আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে সুশান্ত সতীনাথবাবুর কাছে রহস্যোদ্ধারের গল্প শুনতে লাগলো।

'তোমার ধৈর্যের প্রশংসা করি।' শুরুতেই হাসতে হাসতে বললেন সতীনাথ বাবু। 'এমন একটা রহস্য উদ্ধারের কাহিনী, যার সঙ্গে তোমারও ভাগ্য অনেকখানি জড়িত, জানবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তুমি যেভাবে দমন রেখেছ তা সত্যিই অভাবনীয়। আমি তো ভেবেছিলাম, খাবার আগেই যেন-তেন-প্রকারেণ ব্যাপারটা আমার কাছ থেকে জেনে নিয়ে

খেতে বসবে, নইলে গলা দিয়ে ভাত নামবে না। অথচ দিব্যি লক্ষ্মী ছেলেটির মত তুমি খেয়ে উঠলে; আমি হলে তো পারতাম না!'

সুশান্ত জড়িত কণ্ঠে বললো, আপনি যে আগে বলবেন না বললেন, তাই বাধ্য হয়েই—। পীড়াপীড়ি করলে পাছে আপনি রাগ করেন তাই আর ও প্রসঙ্গ তুলি নি। কিন্তু ভাত আমার সত্যি গলা দিয়ে নামে নি। হাত দিয়ে ভাত নাড়াচাড়া করেছি, মুখেও তুলে দিয়েছি, কিন্তু সে কতটুকু? তাও চিবুবার নাম করে সময় কাটিয়েছি শুধু। আপনিই বলুন, ও অবস্থায় কেউ কি খেতে পারে?"

"আঃ, খাওয়াই হয় নি তোমার ছি ছি। আমি তো অতটা লক্ষ্য করি নি। তা হলে আর তোমাকে কষ্ট দিতাম না। যাক, এবার শোন, ভাল কথা, আসামী তিনজনকে তো দেখলে? ওদের কাউকে কি তুমি সন্দেহ করেছিলে?'

"একজনকে একটু একটু সন্দেহ হয়েছিল; অন্তত সে হয়তো ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিল বলে আমার মনে হয়েছিল। সে হচ্ছে আমাদের ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার, একটা চাবি তো তার কাছেই থাকত। কিন্তু তদন্তের সময় সে সেটা দিতে পারে নি, হারাবার কোন যুক্তিসম্মত কৈফিয়ৎ দেয় নি। অথচ পুলিশ তা নিয়ে অতটা হৈ চৈ করল, না-কেবল তাকে একটু লোকদেখানো নজরবন্দী করে রাখলো, আমার মত। ব্যাঙ্ক থেকে তাকে সাময়িকভাবে সাসপেণ্ডও করা হল না। সে দিব্যি আগের মতই ব্যাঙ্কের কাজ করে যেতে লাগল। অবশ্য ব্যাঙ্কের সকলেই আমার উপর খাপ্পা ছিল। কারণ আমি কাজের ডিসিপ্লিনের ওপর বেশ একটু কড়াভাবেই জোর দিচ্ছিলাম বলে। আচ্ছা কাকা বলুন তো—এসব ব্যাপারে স্ট্রীক্‌ট্ হওয়াটা কি অন্যায় হয়েছিল?'

"নিশ্চয়ই নয়। তবে কড়া হওয়ার ধরনটা একটু বুঝে শুনে, সামলে করতে হয়, ইংরাজিতে আমরা যাকে বলি 'ট্যাক্‌ট্‌ফুলি।

'হ্যাঁ আমি বোধ হয় সেরকমভাবে করতে পারি নি! আর ঐজন্যেই ক্যাশিয়ার যখন আমার কাছে কোন জবাব দিহি করতে অস্বীকার করল তখন আমি সেটা ওদের অসহযোগিতারই একটা অঙ্গ বলে ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশ কেন ওকে ও-ভাবে ছেড়ে দিল তা বুঝতে পারছি না!'

'পুলিশের পক্ষ থেকে কারা কারা এসেছিলেন মনে আছে?

'হ্যাঁ, বড়কর্তা ছোটকর্তা দুজনেই এসেছিলেন এবং—'

'এবং যেহেতু বড়কর্তা মোটামুটি ভালোমানুষ আর ছোটকর্তাই এসব ব্যাপারে বেশি কর্মদক্ষ কাজেই ভূমিকাটা তাঁরই ছিল বেশি। তাই না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আসামীদের মধ্যে সেই ছোটকর্তাকে দেখে আমি তো তাজ্জব বনে গেছি।'

সুশান্তকে একরকম থামিয়ে দিয়েই সতীনাথ বাবু বললেন, 'দুনিয়ায় এমন অনেক কিছুই তাজ্জব ব্যাপার প্রতিনিয়ত ঘটছে। ছোটকর্তার ঐ যে সর্বক্ষণ কাজ-কাজ-কাজ, কাজ ছাড়া তিনি কিছুই বোঝেন না—এটা কি একটু বাড়াবাড়ি বলে তোমার মনে হয় নি? আমার তো প্রথম দিনই কেমন খটকা লেগেছিল। আর তদন্তের সময় ওপরওয়ালাকে ডিঙ্গিয়ে-তিনি যে নিতান্ত ভালোমানুষ, পুলিশি মেজাজের অভাব আছে তাঁর মধ্যে এইরকম একটা ভাব দেখিয়ে আগ বাড়িয়ে তদন্তের প্রধান ভূমিকা নেওয়াটাও আমায় তেমন ভালো লাগে নি। আসলে ক্যাশিয়ার বাবুকে কৌশলে আড়াল করে রাখাটাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কারণ ষড়যন্ত্রের মধ্যে ক্যাশিয়ার বাবু ছাড়া তাঁরও যে একটা বড় ভূমিকা আছে সেটা তো আর কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না? ক্যাশিয়ার বাবুকে তাঁর পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়ে তিনি বাঁচিয়ে দেবেন এমন একটা প্রতিশ্রুতি নিশ্চয়ই ছিল; আর তাঁর পদমর্যাদার দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে এটা তাঁর পক্ষে খুবই সহজ কাজ নয় কি?

সুশান্ত ঘাড় নাড়লো।

সতীনাথ বাবু বলে চললেন—'এখানে প্রথমেই তদন্তের ধরন দেখে আমার খুব একটা ভালো লাগে নি। কিন্তু তখনও তেমন কোন সন্দেহ আসে নি মনে। তবে একটু সজাগ থাকতে হবে এইরকম ঠিক করে রেখেছিলাম। আমার গোয়েন্দাগিরিতে যেটুকু নামটাম হয়েছে তার ফলে থানার কর্তাদের সঙ্গে একটু বেশি দহরম মহরম করা আমার পক্ষে কষ্টসাধ্য নয়। আমি বলাবাহুল্য সে সুযোগ নিয়েছিলাম। আর এ ব্যাপারে আমার আর একটা আচমকা সুযোগ এসেছিল যখন জানলাম যে বড়কর্তা একজন কবি। কোন পত্রিকায় তাঁর কবিতা বেরোয় কিনা কিংবা কখনও বেরিয়েছে কিনা আমার জানা নেই। তবে তিনি যে কবিতা লিখতে আর সে কবিতা শোনাতে ভালোবাসেন তা জানতে পেরে আমার একটা মস্ত সুবিধে হয়ে গিয়েছিল। আমি তাঁর কবিতার মস্ত সমঝদার এই ভাবটা দেখিয়ে তাঁর সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ করে নিয়েছিলাম অনেক বেশি এবং তা থেকে আমার অনেক সংশয়ের নিরসন হয়েছিল; কিছু কিছু সূত্রও জুটে গিয়েছিল। অপরপক্ষে ছোটকর্তার সঙ্গে আলাপ করেও কম লাভ

হয় নি। লোকটি যে কাজপাগল, কাজ ছাড়া জীবনে আর কিছু বোঝেন না এটা সর্বদা তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন, যা নাকি আমার কাছে খুবই অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। তবে তিনি যে এই ব্যাঙ্ক ডাকাতি ষড়-যন্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত সে সন্দেহ প্রথম দিকে ততটা হয় নি। পরে ঘটনাচক্রে আপনিই সেটা ধরা পড়ে যায়।'

'ডান হাতের তর্জনীটি ঠোঁটের উপর চেপে ধরলেন'

সুশান্ত বিস্মিতভাবে শুনে যাচ্ছিল। হঠাৎ সতীনাথ বাবু কথা পালটে বললেন, "ভালো কথা, তোমার সরযূ প্রসাদের কোন খবর তো বোধ হয় আজও পাও নি?"

"না, সে থাকলে আপনার এই রহস্যোদ্ধারের ব্যাপারটা হয়তো আরও তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারতেন?"

'কিরকম?'—সতীনাথ বাবু ভ্রূকুঁচকে সুশান্তর দিকে তাকালেন।

'এখানে সে-ই ছিল আমার সত্যিকারের বন্ধু। এখন-কার লোকদের সঙ্গে পরিচয়-টরিচয় যা কিছু সবই প্রায় তার সাহায্যেই হয়েছিল। তার কাছ থেকে যখন তখন নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি আমি। আমাকে এরকম ঘোরতর বিপদে পড়তে দেখলে সে নিশ্চয়ই তার সাধ্য মত সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসত। এখানে আপনি ভাবতে পারবেন না কাকা কিরকম জনপ্রিয় ছিল সে! তার ব্যবহারে সব্বাই তাকে পছন্দ করত। তা ছাড়া এখানকার অনেক টুকিটাকি খোঁজখবর পাওয়া যেত তার কাছে, যার সাহায্যে হয়তো অনেক আগেই আপনার কাজ হাসিল হয়ে যেত।"

তার উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে সতীনাথ বাবু বললেন, "আমার দুর্ভাগ্য। তোমার বন্ধুটির সঙ্গে দেখা হল না। আর হবেও না কোন দিন। সরযূপ্রসাদ তো আর নেই।"

'নেই! সে কি?'—সুশান্ত প্রায় লাফিয়ে উঠল, কোথায় খবর পেলেন আপনি? কিছু বলেন নি তো!

সতীনাথ বাবু গম্ভীরভাবে বললেন, 'গীতা পড়েছ? সেই বিখ্যাত শ্লোকটা মনে পড়ছে?—"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোহারানি। তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"—অর্থাৎ পরনের কাপড় পুরোনো হয়ে জীর্ণ হয়ে গেলে মানুষ যেমন সেই কাপড় ছেড়ে ফেলে নতুন কাপড় পরে, সেই রকম মানুষের শরীরও যখন জীর্ণ হয়ে যায় তখন সে সেই শরীর পরিত্যাগ করে আবার নতুন শরীর ধারণ করে। তার মানে আবার জন্ম গ্রহণ করে নতুন চেহারা নিয়ে।'

সুশান্ত ঘাড় নেড়ে বললো, 'পড়েছি বৈকি! জন্মান্তর বাদ যারা মানে তারা সকলেই গীতার এই বিখ্যাত শ্লোকটির কথা শুনেছে। কিন্তু হঠাৎ এ কথা বলছেন কেন? সরযূপ্রসাদ সত্যি নেই? সে কি তা হলে মারা গেছে? কবে? কোথায়? কি করে জানলেন?" বলেই সে মাথা নীচু করে কাঠের পুতুলের মত স্তম্ভিত হয়ে গেল।

সতীনাথ বাবুর মুখের মৃদু হাসি কিন্তু সেই সাংঘাতিক শোকাবেগ লক্ষ্য করেও একটুও কমল না। তিনি ধীর কণ্ঠে বললেন, "না, ঠিক মারা যায় নি, তবে মারা গেছে বললেও ভুল হবে না। আমাদের কেশব বারে বারে নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিলেন এও কতকটা সেই-রকম বলতে পার।"

সুশান্ত মুখ তুলে বিস্মিত কণ্ঠে বললো, 'কেশব ? কোন্ কেশবের কথা বলছেন ?"

"কি আশ্চর্য ! কেশবের নাম শোন নি হিন্দুর ছেলে হয়ে জয়দেবের গীতগোবিন্দের সেই কেশব। দশাবতার স্তোত্র যে কেশবকে নিয়ে লেখা ? সেই প্রলয় পয়োধি জলে ধৃতবানসি বেদম্, বিহিত বহিত্র চরিত্রমখেদম্, কেশবধৃত মীনশরীর জয় জগদীশ হরে'।

তারপর 'ক্ষিতিরতি বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে, ধরণী ধারণকিণ চক্র গরিষ্ঠে, কেশব ধৃত কূর্ম শরীর জয় জগদীশ হরে "যিনি মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন ইত্যাদি নানা অবতাররূপে দেখা দিয়েছিলেন সেই কেশবের কথা বলছি। কোনও কেশব দত্তও নয়, কেশব চাটুজ্যেও নয়, কেশব সেনের কথাও বলছি না।"

সুশান্ত আর থাকতে পারল না ; বললো, "দোহাই কাকাবাবু, আর ওভাবে হেঁয়ালিতে কথা বলবেন না। যা বলবার খোলাখুলি বলুন। আপনি আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছেন না।"

"কেন পারব না ? খুব পারছি। আমার নিজেরও তো ঐ অবস্থা হয়েছিল দিন কয়েক আগে। গভীর সন্দেহ জাগছিল। একটার পর একটা সূত্র সংগ্রহ করে সেগুলিকে তোমাদের অঙ্কে যাকে বলে 'থিওরী অব্ প্রবাবিলিটি' অর্থাৎ সম্ভাবনাসূত্র দিয়ে বিচার করবার চেষ্টা করছিলাম। একটার পর একটা জট খুলতে খুলতে শেষে একটা জায়গায় আবার নতুন করে জট বেঁধে গেল। সেটা ছাড়াবার জন্যে আবার ছুটতে হ'ল কলকাতায় ডাক্তার মুখার্জির বাড়ি। ওঃ, কয়েকটা দিন কী নাকালটাই না করেছে আমাকে তোমার ঐ সরযূপ্রসাদ ! তারপর যখন জানতে পারলাম ঐ সরযূপ্রসাদ আর সত্যি সত্যি পৃথিবীতে নেই, আর কখনও তার, কি রূপ বলব, শ্যাম রূপ ? হ্যাঁ, সেই শ্যামরূপ নিয়ে ফিয়ে আসবে না, তখনই মনে হ'ল আমার অঙ্ক তা হলে এবার ঠিক মিলে যাবে। [ক্রমশঃ]

16 টাউন সেণ্ড রোড, কলি-25

PRODUCE ★★ PRESERVE ★★ PROSPER

Through a network of Warehouses all over West Bengal. The State Warehousing Corporation offers services tor Storage and Preservation of Cereals, Pulses, Jaggery, Cotton, Jute, Potatoes and other notified commodities like Textiles, Paper, Cement, Steel, Coal, Machinery and other merchandise of any size or weight against lossess from pests, rodents, birds and vagaries of weather.

Warehouse Receipt issued by the State Warehousing Corporation is a negotiable instrument for raising loan from nationalised and State Banks.

The Corporation also runs a Cold Storage at Tarakeswar, District. Hooghly.

For Scientific Storage
Please contact your nearest State Warehousing Centre
or

West Bengal State Warehousing Corporation

(A GOVERNMENT UNDERTAKINGS)

6A, Raja Subodh Mullick Square (4th Floor)
Calcutta : 700013

Phone No : 26-6035, 26-6060, 26-6061, 26-6062

পেট্রোলিয়মের ইতিবৃত্ত

স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়

আমাদের বর্তমান সভ্যতার আধার, এই বিংশ শতাব্দীর প্রধান মেরুদণ্ডস্বরূপ অপরিহার্য জ্বালানী পেট্রোলিয়ামের আর এক নাম তরল সোনা। এই পেট্রোলিয়াম আজ কেবল সোনার মত মহার্ঘই নয়, দিনে দিনে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে। প্রচণ্ড অর্থনৈতিক চাপ পড়ছে নানা দেশে, বিশেষ করে আমাদের ভারতবর্ষে যেখানে প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন কেবল এক-তৃতীয়াংশ। পেট্রোলিয়াম যে কেবল যানবাহন চলাচলের জন্যেই ব্যবহার করা হয় তা নয়, এর বিরাট অংশ যায় নানা ধরনের অত্যাবশ্যক রাসায়নিক শিল্পজাত বস্তুর উৎপাদনে, যার অন্য নাম পেট্রোকেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রি। এই পেট্রোলিয়াম থেকেই তৈরী হয় সিন্থেটিক রাবার, প্লাস্টিক, বেঞ্জিন, ডিটারজেন্ট, অ্যালকোহল, ফার্টিলাইজার ইত্যাদি নানা দ্রব্য।

সাধারণতঃ পেট্রোলিয়াম বলতে আমরা বুঝি প্রকৃতির মধ্যে পাওয়া একরকম তরল দাহ্য পদার্থ যার অন্য নাম অশোধিত তেল বা ক্রুড অয়েল। পেট্রোলিয়াম শব্দটা ব্যবহার হয়েছে ল্যাটিন পরিভাষা অনুসারে, মানে পাথুরে তেল (Petro = rock, Oleum = oil)। পেট্রোলিয়ামের মুখ্য উপাদান হলো নানা ধরনের হাইড্রোকার্বন, যেমন প্যারাফিন ন্যাপথিন ইত্যাদি এবং সামান্য পরিমানে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, সালফার। তরল অবস্থা ছাড়াও পেট্রোলিয়ামের আরও দুই রূপ দেখতে পাওয়া যায় কঠিন ও গ্যাসীয়। কঠিন রূপে আমরা দেখতে পাই অ্যাস্‌ফলট, পিচ'টার ইত্যাদি এবং গ্যাসীয় রূপের নাম ন্যাচারাল গ্যাস।

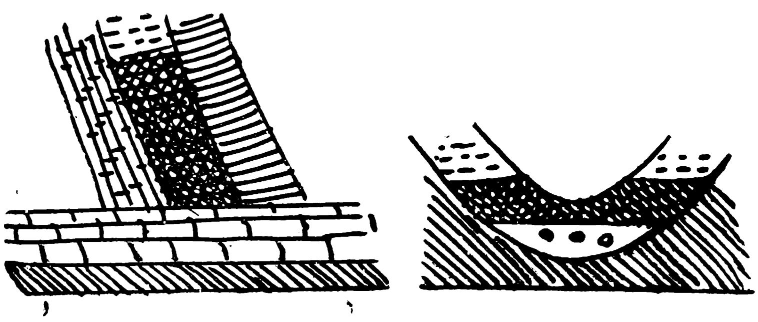

গ্যাস, পেট্রোলিয়াম ও জলের স্তর

প্রাচীন পুঁথিপত্র ঘেঁটে আমরা জানতে পারি যে, মানুষ বহু যুগ আগে থেকেই পেট্রোলিয়ামের খবর জানত। হেরোডোটাস (খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী), ডিওডোরাস (খৃঃ প্রথম) এবং অন্যান্য পণ্ডিতের লেখা বই পড়ে জানা গেছে যে, প্রাচীন ভারত, চীন, পারস্য, সিরিয়া ও ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যেত। সেখানকার লোকেরা প্রদীপ ধরানোর জন্যে এর ব্যবহার করেছে। প্রকৃতপক্ষে পেট্রোলিয়ামের আবিষ্কার হয় খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে, যখন সম্রাট আলেকজান্ডার সসৈন্যে ক্যাসপিয়ান সাগরের উপকূলে অবস্থান করছিলেন। সে-সময় জাদ্রাকাত নামে এক জায়গায় (বর্তমান ইরানের অন্তারবাদ জায়গা) একরকম তরল পদার্থ পাওয়া যায়, যেটাতে আগুন পড়লে জ্বলে উঠে। সেসময় তারা ঐ পদার্থটিকে রাত্রে ক্যাম্পে আলো জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করতে শুরু করে। পরে ক্রমশ ধীরে ধীরে পেট্রোলিয়াম অন্য নানা জায়গায় আবিষ্কৃত হয়।

আমাদের ভারতবর্ষে পেট্রোলিয়ামের আবিষ্কার বেশ মজার এবং সে কৃতিত্ব একটা হাতির। প্রায় একশ বছর আগে ভারতের আসাম অঞ্চলে প্রথম তেল আবিষ্কৃত হয়। সে সময় আসাম রেলওয়ে ও ট্রেডিং কোম্পানি আসামের জঙ্গলে রাস্তা তৈরীর কাজে একদল হাতিকে ব্যবহার করেছিল কাঠের গুঁড়ি বয়ে আনার জন্যে। একদিন ঐ হাতির গায়ে কালো তেলতেলে বস্তু দেখা গেল। কথাটা কোম্পানির অধিকর্তার কানে গেল। পরে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, ঐ হাতিটা একটা তেলের পুকুরে ডুব দিয়ে এসেছিল। সেই জায়গায় আজকে দাঁড়িয়েছে আসামের ডিগবয় অয়েল ফিল্ড।

পেট্রোলিয়ামের জন্মরহস্য আজও আমাদের অগোচরে। সঠিকভাবে কেউ বলতে পারেন নি কিভাবে পেট্রোলিয়াম তৈরী হয়। তবে বেশির ভাগ বিজ্ঞানীদের অভিমত এই যে, একরকম সামুদ্রিক কীটাণু যার নাম জুপ্লাঙ্কটন ও ফাইটোপ্লাঙ্কটন এবং নানা ধরনের মৃত সামুদ্রিক প্রাণীর দেহাবশেষ থেকে পেট্রোলিয়াম তৈরী হয়। মৃত দেহাবশেষগুলি ক্রমশ সমুদ্রের নিচে পাথরের স্তরে জমা হতে থাকে। এই সব স্তরীয় শিলার মধ্যে তাপ ও চাপের প্রভাবে ঐ সব প্রাণীর দেহাবশেষ থেকে পেট্রোলিয়াম ও গ্যাস নির্গত হয় সমুদ্রের মধ্যে প্রায় এক থেকে দু' কি. মি. গভীরে।

অনেকের মত যে, এক ধরনের ব্যাকটিরিয়া এই তেল প্রস্তুত কাজে সাহায্য করে এবং গভীরতা প্রায় 6 থেকে 8 কি. মি. ও 200—300°. সে. তাপমাত্রা যথাক্রমে প্রয়োজন।

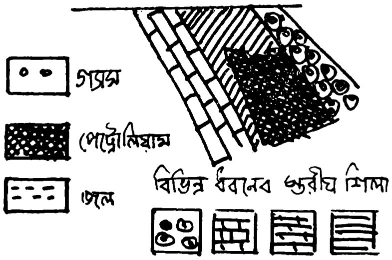

পেট্রোলিয়াম সাধারণত পাওয়া যায় স্তরীয় শিলার মধ্যে, বিশেষ করে এই স্তরীয় শিলার ফোল্ডিং-এরআন্টি ক্লাইন-এর মধ্যে নানা ধরনের স্তরীয় শিলা আছে যেখানে পেট্রোলিয়াম প্রধানত পাওয়া যায়। যেমন লাইমস্টোন, স্যাণ্ডস্টোন, শেল এই সব স্তরীয় শিলা সমুদ্রের মধ্যে জন্ম নেয় নানাভাবে। সমুদ্রের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে অধঃক্ষেপের দ্বারা এবং নদী বাহিত পাথরের

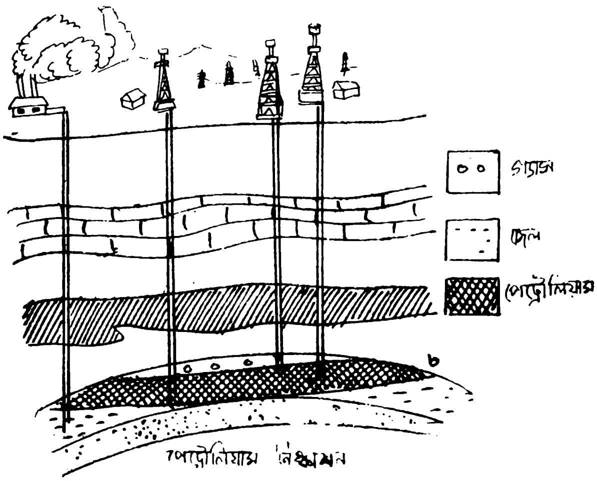

পেট্রোলিয়াম নিষ্কাশন

ক্ষুদ্র অংশে জমা হয়। যদিও আজকে অনেক জায়গায় আমরা তেল পাই, পাহাড়পর্বত অঞ্চলে, যেমন আসামে। তবু একদিন ঐ সব জায়গা সমুদ্রের নিচে ছিল। সেসময় সেখানে তেল জমা হয়েছিল। পরে নানা ভৌগোলিক কারণে সমুদ্র সরে গিয়ে সেখানে পাহাড়-পর্বত তৈরী হয়েছে। এই সব স্তরীয় শিলার যে অংশে তেল জমা থাকে তাকে বলে রিজার্ভয়ের রক বা সঞ্চয় শিলা। এই সঞ্চয় শিলায় মধ্যে পেট্রোলিয়াম নানাভাবে পাওয়া যায়, যাকে বলে অয়েল ট্রাপ।

পেট্রোলিয়ামের আবিষ্কারের পর থেকেই নানা জায়গায় তেল খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তেল আবিষ্কারের কোন সঠিক পদ্ধতি নেই। বরং বলা চলে তেল খোঁজার পুরো ব্যাপারটিই এক ধরনের জুয়া খেলা। আমাদের জানা আছে, কি ধরনের পাথরের মধ্যে এবং অন্যান্য ভূতাত্ত্বিক পরিবেশের মধ্যে সাধারণত তেলের সন্ধান মেলে। কতকটা সেইরকম অনুকূল পরিবেশের খোঁজ নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর পর পাওয়া গেলে তেল বের করার জন্যে খনন বা ড্রিলিং শুরু হয়। তবুও এরপর প্রতি দশটা ড্রিলিং-এ কদাচ একটাতে তেলের সন্ধান পাওয়া যায়। অথচ এই অয়েল ড্রিলিং-এর খরচ বিরাট। এক একটি দু'-হাজার মিটার গভীর ড্রিলিং-এর খরচ লক্ষ টাকারও বেশি। সাধারণতঃ পাঁচ হাজার মিটার পর্যন্ত ড্রিলিং করা হয় তেল খোঁজার জন্যে। কোন কোন জায়গায় কয়েক কিলোমিটারও ড্রিলিং হয়। সেজন্যে প্রধান তেল নিষ্কাশনের আগেই অনেক ছোটখাটো পরীক্ষা মূলক ড্রিলিং করা হয়। পরীক্ষামূলক ড্রিলিং-এর আগে আমরা খোঁজ করি কোন কোন জায়গায় তেল পাওয়া যেতে পারে। এই অনুমান আসে নানা ধরনের ভূতত্ত্বের গঠনমূলক পরিবেশ ও পৃথিবীর ওপরে ও নিচের তেলের অবস্থানের ইঙ্গিত থেকে। যেমন যদি কোথাও তেলের হাল্কা স্রোত ভূগর্ভের বাইরে বেরিয়ে আসে, যাকে বলে অয়েল সীপেজ, কিংবা কঠিন পেট্রোলিয়ামের ডাইক্ দেখা যায় এরকম জায়গায় তেল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এগুলিকে বলে সারফেস্ ইণ্ডিকেশন বাউপরিতলের সংকেত। পৃথিবীর অনেক জায়গায় তেল আবিষ্কার করা হয়েছে এই সারফেস ইণ্ডিকেশনের ওপর নির্ভর করে, বিশেষ করে ইরান, মেক্সিকো ও ভেনেজুয়েলায়। এছাড়া আছে জিও-লজিক্যাল ম্যাপিং ও জিওফিজিক্যাল প্রসপেকটিং। জিও-লজিক্যাল ও জিওফিজিক্যাল পদ্ধতিতে আমরা পৃথিবীর নিচের গঠন ও কি কি ধরনের পাথর আছে তা জানতে পারি। যদি তেল থাকার মতো পাথরের সন্ধান মেলে

তখন পরীক্ষামূলক ড্রিলিং করা হয় এবং তারপরে তেল নিষ্কাশনের জন্যে প্রকৃত ড্রিলিং শুরু হয়।

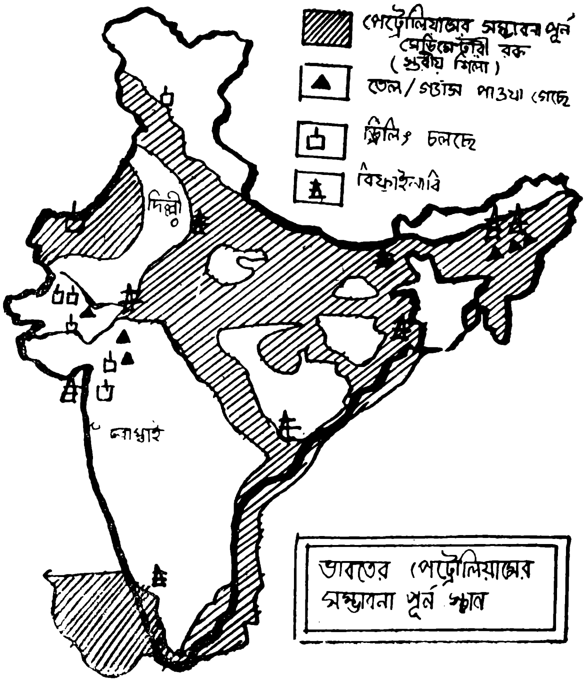

ভারতের পেট্রোলিয়ামের সম্ভাবনা পূর্ণ স্থান

যে সব সঞ্চয় শিলার মধ্যে তেল থাকে তা সচ্ছিদ্র হয় এবং তার উপর ও নিচে নিশ্ছিদ্র পাথরের স্তর থাকে। এই নিশ্ছিদ্র স্তরের জন্যে তেল বেরোতে পারে না এবং মধ্যেকার প্রবেশ্য বা সচ্ছিদ্র শিলার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। এই সচ্ছিদ্র শিলার মধ্যে ড্রিলিং করে তেল বার করা হয়। কখনও কখনও এর সচ্ছিদ্র সঞ্চয়াধারের মধ্যে তেল নড়াচড়া করে এবং তেল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরতে থাকে, তখন তাকে বলে 'অয়েল-মাইগ্রেশন' বা তেলের স্থানান্তরীকরণ। এই কারণেই আমাদের তেলের একটা বিরাট অংশ আমরা হারিয়ে ফেলেছি আসাম অঞ্চলে। আসামের তেলের একটা বিরাট অংশ বার্মা বা ব্রহ্মদেশের দিকে অয়েল মাইগ্রেসনের ফলে সরে গেছে।

পেট্রোলিয়াম অশোধিত অবস্থায় পাওয়া গেলে এটাকে শোধন করার পরই ব্যবহারযোগ্য হয়। এতে অনেক অপ্রয়োজনীয় পদার্থ থাকে। সেগুলো শোধন করে বার করে দেওয়া হয়। ক্রুড অয়েল বা অশোধিত তেলকে রিফাইনারিতে নিয়ে যাওয়া হয় শোধনের জন্যে। শোধনের পর আমরা পাই নানা ধরনের জ্বালানী। যেমন গ্যাসোলিন, কেরোসিন, লুব্রিকেটিং অয়েল, ডিজেল, জেট ইঞ্জিন জ্বালানী ইত্যাদি। যানবাহন চলাচলের পরই পেট্রোলিয়ামের প্রধান ব্যবহার হয় রাসায়নিক শিল্পে। বিশ্বের শতকরা নব্বই ভাগ জৈব রাসায়নিক শিল্প, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্লাস্টিক, পলিথিন, ডিটারজেন্ট ড্রাই ক্লিনিং-এর উপকরণ ইত্যাদি সবই তৈরী হয় পেট্রোলিয়াম থেকেই। এছাড়া আছে সিন্থেটিক ফাইবার বা কৃত্রিম তন্ত যেমন পলিয়েস্টার, অ্যাক্রাইলিক, যা থেকে জামাকাপড় তৈরী হচ্ছে আজকাল, সিন্থেটিক বা কৃত্রিম রাবার যা থেকে মোটরগাড়ির টায়ার ইত্যাদি তৈরী হয়। অনেক জৈব রাসায়নিক পদার্থ এবং রান্নার কাজে ব্যবহারের গ্যাস এল পি জি-এ থেকেই তৈরী হয়।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, পেট্রোলিয়ামের নানাবিধ উপযোগিতা। বর্তমান শতাব্দীর শিল্পজাত সবরকম সামগ্রীই প্রায় পেট্রোলিয়াম থেকে তৈরী হয়ে থাকে। সেজন্যেই এর আরেক নাম তরল সোনা। এই তরল সোনা যার কাছে যত আছে, আজকের দুনিয়ায় সেই রাজা। তার হাতেই অর্থনৈতিক চাবিকাঠিটা। ভারতবর্ষে এখনও পর্যন্ত এর উৎপাদন অতি সামান্যই, প্রয়োজনের একের তিন

পেট্রোলিয়াম শোধন ও প্রাপ্য বস্তু

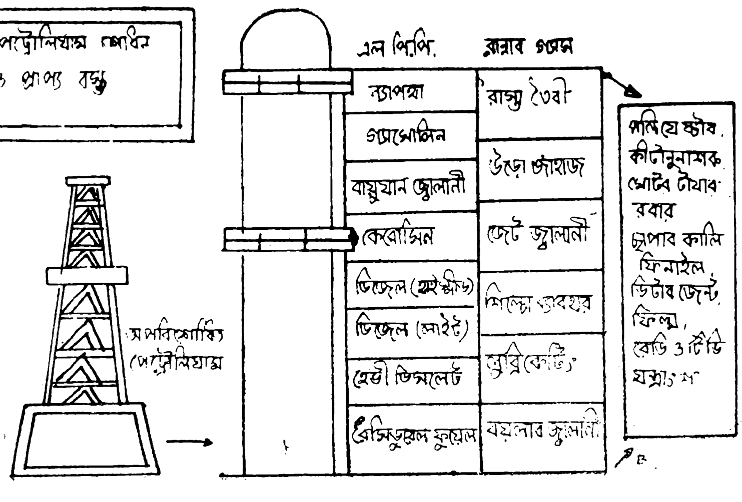

ভাগ। আমাদের দেশে পেট্রোলিয়াম মুখ্যত পাওয়া যায় আসামে ও গুজরাতে। দেশের নানা স্থানে তেল খোঁজার কাজ জোরদার চলছে। আমরা আশা করছি, ভবিষ্যতে হয়তো আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে এই তরল সোনা খুঁজে বার করতে পারব। আমাদের দেশের নানা জায়গায় পেট্রোলিয়াম পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সে সব জায়গা মুখ্যত হলো আসাম, ত্রিপুরা, জম্মু-কাশ্মীর, পাঞ্জাব, আন্দামান নিকোবর, গুজরাত, পশ্চিমবঙ্গের বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে এবং গোদাবরী, নর্মদা মহানদীর উপত্যকায়। এছাড়া সমুদ্রের কিছুটা অভ্যন্তরে, যাকে 'অফসোর' অঞ্চল বলে, সেরকম জায়গায় (যেমন বম্বে হাই) তেলের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

এই তরল সোনা খোঁজের জন্যে সমগ্র বিশ্বজুড়ে চলছে প্রচণ্ড চেষ্টা। এই জিনিসটি না থাকলে আগামী কালে কেবল যে শিল্পই বন্ধ হয়ে যাবে তা নয়, চলবে না কোন গাড়ির চাকা, মাল সরবরাহ হবে বন্ধ, যোগাযোগ হবে বিচ্ছিন্ন, যানবাহন চলাচল হয়ে যাবে বন্ধ। এক কথায় সমগ্র মানবসভ্যতার গতি হবে রুদ্ধ।

স্টিল অথারিটি অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, রাঁচি—834002

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

- **কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ায় প্রকাশিত হয়।**
- **প্রতি সংখ্যার মূল্য ২.৫০ টাকা। বারো মাসের বৈশাখ-চৈত্র গ্রাহক চাঁদা ২৫ টাকা। শারদসংখ্যার মূল্য পৃথক।**
- **গ্রাহকদের ডাকমাশুল লাগবে না। under certificate of posting-এ গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রী ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত ৩০ টাকা পাঠাতে হবে।**
- **M. O. বা Bank Draft KISHORE JNAN-BIJNAN-এর নামে পাঠাতে হবে।**

গ্রাহক কার্ড রিনিউ করার শেষ তারিখ
16ই জুন 1983

ভাবনা

অনির্বাণ চক্রবর্তী

গামা-রশ্মি

গামা রশ্মি হলো এক ধরনের তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ। রেডিয়াম এবং অন্যান্য অনেক তেজস্ক্রিয় মৌলের পরমাণু বিভাজনের সময় গামারশ্মি উৎপন্ন হয়।

1899 সালে ব্রিটিশ পদার্থবিদ্ আরনেস্ট রাদারফোর্ড তেজস্ক্রিয়তার উপর গবেষণা শুরু করে তিনরকমের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ আবিষ্কার করলেন। তিনি এগুলিকে আল্ফা, বিটা ও গামা রশ্মি নামে অভিহিত করেন। আল্ফা রশ্মিকে পাতলা কাগজের টুকরো দিয়ে আটকে দেওয়া যায়। বিটা রশ্মি কয়েক মিলিমিটার পুরু অ্যালুমিনিয়াম পাত ভেদ করে চলে যেতে পারে। এবং গামা রশ্মি বেশ পুরু সীসার পাত ভেদ করে চলে যায়। আল্ফা-রশ্মি সেকেণ্ডে 1200 মাইল পর্যন্ত বেগ নিয়ে চলে। বিটা রশ্মি চলে সেকেণ্ডে 80,000 থেকে 180,000 মাইল পর্যন্ত বেগ নিয়ে এবং গামা রশ্মি চলে আলোকের গতিবেগ নিয়ে অর্থাৎ সেকেণ্ডে 189,000 মাইল বেগে।

শিল্পে এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে গামারশ্মির গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার আছে। উৎপাদন প্রক্রিয়াগুলিতে উপজাত হিসাবে প্রাপ্ত তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলিও গামারশ্মি বিকিরণ করে। গামারশ্মি ব্যবহার করে ঢালাই করা বস্তুসামগ্রীর এবং বয়লার ও অন্যান্য চাপ পাত্রসমূহের জোড়া অংশগুলির বিকিরণীচিত্র পাওয়া যায়।

সাবান

নানাধরনের উৎপাদন এবং প্রধানত চর্বি এবং তেল থেকে সাবান প্রস্তুত করা হয়।

সাবান চালু হওয়ার আগে প্রথম শতাব্দীতে শরীর এবং কাপড়চোপড় ধোওয়ার কাজে ফুলার-এর মাটি নামক এক ধরনের মিহি কাদার মতো পদার্থ ব্যবহার করা হত, যার প্রয়োগে তেল এবং ধুলো আলগা হয়ে যেত।

উদ্বৃত্ত চর্বিখণ্ড লোহার পাত্রে সিদ্ধ করে প্রথম সাবান প্রস্তুত করা হয়। এর সঙ্গে লাই নামক কাঠের ছাই থেকে প্রস্তুত ক্ষরীয় দ্রবণ যোগ করে হলুদ রঙের 'নরম সাবন' তৈরী করা হত। শক্ত সাবান তৈরী করা হত বেশিক্ষণ সিদ্ধ করে এবং লবণ যোগ করে।

আধুনিক কারখানাগুলিতে নারিকেল অথবা তুলাবীজ থেকে পাওয়া তেল, পটাশ অথবা সোডিয়াম সরবরাহকারী লাই এবং লবণ, রঞ্জক, সুগন্ধি এবং বাদামতেল ও গ্লিসারিন থেকে উৎপন্ন অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত পদার্থ ব্যবহার করে ব্যয়-বহুল স্নানের এবং দাঁড়ি কামানোর সাবানগুলি প্রস্তুত করা হয়।

সস্ত্রীক লণ্ডনে এসে পৌঁছুলেন জগদীশচন্দ্র
বক্তৃতা দিলেন রয়াল সোসাইটি হলে।
বক্তৃতা শেষে স্বতঃস্ফুর্ত অভিনন্দন জানালেন বিশিষ্ট শ্রোতৃবর্গ
সমস্ত পত্র-পত্রিকা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ
কে এই সায়ান্টিস্ট!
সত্যই অতুলনীয় আপনার আবিষ্কার!
তখন জগদীশচন্দ্র-এর এক বন্ধু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এলেন।
মিঃ বাসু, আপনার এ আবিষ্কার একেবারে মৌলিক। আপনি এটা পেটেন্ট করিয়ে নিন। এতে—
আপনি লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হয়ে যাবেন। আমি ফর্ম নিয়ে এসেছি আপনি শুধু সইটা করে দিন—
না। এই আবিষ্কার শুধুমাত্র আমার সম্পত্তি নয়, দেশের মানুষের সম্পত্তি। আমি চাই এর দ্বারা দেশের কল্যান হোক

খুদে বৈজ্ঞানিক
দিলীপ দাস
ওটা কি করছিস রে খুদে?
দাঁড়া, আগে কর্কটা এঁটে দিই, তারপর বলছি—
এটা একটা কেমিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে।
টেস্ট টিউব, বিকার, ফ্লাস্ক বার্ণার ইত্যাদি ছেড়ে, বোতল দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট!
কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না? তবে এখুনি হবে—
বাপস্!
দুড়ুম!
খ্যিঃ-খ্যিঃ-খ্যি!
কি, এবার কিছু আইডিয়া হচ্ছে? ইন্ ফিউচার আমি যে একজন বিশ্ব-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হতে পারি সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিস।
তবে এতে ভয়ের কিছুই নেই। এর রহস্যটা তোকে ক্লিয়ার করে দিই
প্রথমে এরকম একটা বোতল নিবি, তারপর এতে কিছু সোডিয়াম কার্বনেট আর ভিনিগার ঢেলে দিবি।

তারপর একটা কর্ক নিয়ে এর মুখে চেপে বসিয়ে দিবি। ব্যাস্, এবার দ্যাখ কি হয়:-
বলি এসব কি হচ্ছে র‍্যা!
কে? জেঠু!
এটা তো দেখছি কাসন্দের বোতল – তা মালগুলো গেল কোথায়?
জেঠু-
গঁক্‌!
মরেচে!
দাম
ক্র-র্-র্-র্-!
আর এখানে দাঁড়ানো উচিত নয় মনে হচ্ছে!
গর্-র্:র্:র্:
গদাহরে, শিগগির জেঠুর মুখ থেকে ছিপিটা খুলে দম্ বার করে দে, নয়ত আমার দম্ বেড়িয়ে যাবে।
একেই বলে অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী

জ্ঞানবিজ্ঞানের বিচিত্র সংবাদ

বরুণ মজুমদার

আগামী অলিম্পিক

আগামী বারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস্ অ্যাঞ্জেলেসে যে অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হবে তার ম্যাসকট নির্বাচিত হয়েছে ঈগল পাখী 'স্যাম' আর প্রতীক করা হয়েছে লাল-সাদা-নীল নক্ষত্র। এদের স্রষ্টা হলো 'ওয়াল্ট ডিসনি' সংস্থা। প্রায় একশোটা দেশের দশ হাজারের মতো প্রতিযোগী এই অলিম্পিকে যোগ দেবেন বলে অনুমান করা হচ্ছে।

জেলের জালে বিরাট তিমি

তেলের দেশ আরব দেশে দুবাই বলে একটা জায়গা আছে। সেখানকার সমুদ্র থেকে গত ডিসেম্বর মাসে স্থানীয় জেলেরা 22 ফুট লম্বা আর 8 ফুট চওড়া একটা বিরাট তিমি মাছ জালে করে ধরেছেন। মহম্মদ বঙ সামাদ নামে পঞ্চাশ বছর বয়স্ক একজন জেলে অন্য কয়েকজন জেলেকে সঙ্গে নিয়ে ছটা মাছ ধরার জালে করে ঐ বিরাট তিমিটা ধরেছেন। আর তিমিটার ওজন কত জানো? পাঁচ টন। তিমিটা অবশ্য খাওয়া যায় নি। তবে তার যকৃত অর্থাৎ লিভারটার ওজন ছিল 50 কিলো গ্রাম। সেই যকৃত থেকে 16 গ্যালন তেল পাওয়া গেছে। তোমরা হয়তো জানো যে, এই তিমির যকৃতের তেল খুব মূল্যবান জিনিষ! দুবাই-এর একটা খবরের কাগজ 'আল' বয়ানে খবরটা কিছুদিন আগে বেরিয়েছিল।

নাকের চৌম্বক শক্তি

আমরা অনেক সময় বলে থাকি নাক বরাবর চলে যান, অমুক বাড়ির ঠিকানা পাবেন। জানি না কথাটা কোথা থেকে এসেছে। তবে এর মধ্যে একটা বৈজ্ঞানিক সত্য আছে। মানুষের নাকে কম্পাস রয়েছে, অথচ আমরা অনেকেই এর ঠিকমত ব্যবহার জানি না। মরুভূমির উপজাতি আর আদিবাসীদের নাকের হাড় পরীক্ষা করে নাকি জানা গেছে যে, তারা এই নাকের হাড়ের সাহায্যেই দিক নির্ণয় করত। প্রাচীনকালে অরণ্য-চারী মানুষ হয়তো এরই সাহায্যে চলাফেরা করত। কিছুদিন আগে তিনজন বৃটিশ বিজ্ঞানী পরীক্ষা করে একথা জানিয়েছেন। ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের এই তিনজন বিজ্ঞানীর নাম জেনিস, রবিন, আর বেকার। তাঁরা জানিয়েছেন যে, রক্তের লৌহ কণিকা থেকে নাকের চৌম্বক শক্তি আসে। সাতটা মাথার খুলির মধ্যে পাউডার ভরে শক্তিশালী চৌম্বক সেক্ষেত্রে এগুলি রেখে তাঁরা পরীক্ষা করে এই তথ্য জানতে পেরেছেন।

ভারতের মনুষ্যবাহী মহাকাশযান

1984 সালের প্রথমার্ধে, ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে মনুষ্যবাহী মহাকাশ যান উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

সোভিয়েত মহাকাশচারী প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর প্রধান, ভ্ল্যাদিমির শাটালভ মস্কোয় এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, ভারত-সোভিয়েত যৌথ মহাকাশ অভিযানের জন্যে এক ব্যাপক ও বহুমুখী গবেষণার কর্মসূচী তৈরী করা হচ্ছে।

ভারত থেকে যে দুজন বৈমানিককে এই যৌথ অভিযানের জন্যে নির্বাচন করা হয়েছে, তাঁরা মস্কোর কাছে প্রশিক্ষণকেন্দ্রে তাঁদের প্রশিক্ষণের প্রথম পর্যায় সম্পূর্ণ করেছেন।

মহাকাশের দস্যু

অনীশ দেব

মহাকাশ-নিরাপত্তা-বাহিনীর প্রধান দপ্তরে চুপটি করে বসে বাবার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় মুশকো চেহারার লোকটা ঢুকলো।

নিরাপত্তা-বাহিনীর দপ্তরে আমার আসার কথা নয়। কিন্তু কি করবো, বাবা যে এখানেই চাকরী করে। আর নানান্ গুণ্ডা-বদমাসদের পাকড়াও করে খুব নামও করেছে। আজ আমাকে নিয়ে বাবার রকেট-ফুটবল ম্যাচ দেখতে যাবার কথা, কিন্তু তা বোধ হয় আর হবে না। কারণ বাবার অফিসের কাজ কখন শেষ হবে কে জানে!

আমি একটি কোণে এমনভাবে বসে আছি যে চট করে কেউ আমাকে খেয়ালই করবে না। চার পাশে সবাই ব্যস্ত। টেলিভিশন, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, ওয়ারলেস, কম্পিউটার, ক্যালকুলেটর—খবরাখবর হিসেবপত্রের যত রকম যন্ত্র থাকা সম্ভব সবই রয়েছে। একরাশ লোক হাঁটাহাঁটি ছুটোছুটি করে হিমসিম খাচ্ছে। তার মধ্যে কারো কারো পরনে মহাকাশচারীর পোশাক অর্থাৎ, রকেট-ট্যাক্সি কিংবা গোয়েন্দাদের স্পেসক্যাব-এক্স থেকে নেমে দপ্তরে ঢুকেছে।

এত লোকের মধ্যেও মুশকো চেহারার লোকটাকে হারিয়ে ফেলার উপায় নেই। কারণ তার মাথায় চুল রয়েছে।

আমাদের গ্রহে দশ-বারো বছর পেরোলেই সবার মাথার চুল খসে পড়ে। আমারও পড়তে শুরু করেছে।

আগন্তুকের চেহারাও প্রকাণ্ড। প্রায় আড়াই মিটার লম্বা, সেই মাপে চওড়াও বটে। টিয়াপাখির মতো নাকটা থ্যাবড়ানো। তবে মুখে একটা অদ্ভুত মজার হাসি, যার জন্যে ভালো লেগে যায়।

এমন সময় বাবা বেরিয়ে এলো নিজের অফিস-ঘর থেকে। আমাকে দেখে চমকে উঠলো, 'কি ব্যাপার, টুটা, তুমি এখানে কি করছ?'

এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমাকে কোথাও নিয়ে যাবার থাকলেই বাবা সব সময় ভুলে যায়। অথচ অফিসের কাজ কখনো ভোলে না। আমি বাবার কাছে এগিয়ে গেলাম। অনুযোগ তুলে বললাম 'বাঃ, আজ না আমাকে রকেট-ফুটবল দেখাতে নিয়ে যাবে!'

'ওহ্-হো!' হঠাৎ সব মনে পড়ে গিয়ে বাবা থতমত খেয়ে গেল। একবার দেখলো হাতে ধরা অফিসের একটা কাগজের দিকে। বোধ হয় ভাবছে—অফিসের কাজ না রকেট-ফুটবল, কোন্‌টা আগে?

কিন্তু ততক্ষণে চুলওলা লোকটা এগিয়ে এসেছে বাবার কাছে।

'আপনিই কি সার্জেন্ট কুকা?'

'হ্যাঁ, আপনি?'

'নীরদ সমাদ্দার। পৃথিবীর সিকিওরিটি কণ্ট্রোল থেকে আসছি।'

'কি ব্যাপার, সমাদ্দার। আমাদের এই টাইটান গ্রহে কি মনে করে?'

'মহাকাশ দস্যু উজি কাপিতানের খোঁজে!'

'আচ্ছা!' হাতের কাগজটা দেখিয়ে বাবা বললোঃ 'এইমাত্র ফিম্ গ্রহ থেকে একটা টাইমগ্রাম পেয়েছি। ওদের ধারণা উজি কাপিতান এই টাইটান গ্রহে আছে।'

'আমিও সেইরকম সূত্র পেয়েই ছুটে এসেছি!' গম্ভীর গলায় নীরদ সমাদ্দার বললেন।

আর কোন কথা না বলে ওরা দুজন রওনা হলো অফিস ছেড়ে। ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে বাবা বললোঃ 'তুমি এসো'—তারপর নীরদ সমাদ্দারের দিকে তাকিয়ে বললোঃ 'আমার ছেলে, টুটা।'

নীরদ সমাদ্দার আমার মাথাটা নেড়ে দিয়ে হাসলো। মজার হাসি।

দপ্তরের গ্যারেজে গিয়ে একটা স্পেসক্যাব-এক্স-এ চড়ে বসলাম আমরা।

এতক্ষণ আমি একেবারে মুখ খুলি নি। যদি খুলতাম তা হলে বাবা আমাকে সোজা বাড়িতে ফেরৎ পাঠিয়ে দিত। কিন্তু স্পেসক্যাব মহাকাশে রওনা হতেই সেই ভয় কেটে গেল। ফলে বাবাকে জিজ্ঞেস করলামঃ 'উজি কাপিতান কে, বাবা?'

বাবা আমাকে দেখে হঠাৎ চমকে উঠে বললো ঃ 'ও, তুমি সঙ্গে এসেছো—'

আসলে নিজেই যে আসতে বলেছে সেটা বেমালুম ভুলে গেছে। তারপর বাবা বললো ঃ 'উর্জি কাপিতান হলো এক কুখ্যাত মহাকাশ-দস্যু।'

বাবার কথার খেই ধরলেন নীরদ সমাদ্দার ঃ 'জানো তো টুটা, মহাকাশে লুঠপাট করা সবচেয়ে সোজা। কারণ মহাকাশের একটা আইন হচ্ছে, বিপদসঙ্কেত পাওয়া মাত্র যে কোন মহাকাশযানকে ছুটে যেতে হবে বিপদে পড়া মহাকাশযানের সাহায্যের জন্যে। সুতরাং উর্জি কাপিতান তার মহাকাশযান নিয়ে মহাশূন্যে ঘুরে বেড়ায়, আর সুযোগ বুঝে মিথ্যে মিথ্যে বিপদসঙ্কেত ছড়িয়ে দেয় আকাশে-বাতাসে। তখন অন্য কোন মহাকাশযান সেই ফাঁদে সহজেই পা দেয়। বোকার মতো ছুটে যায় উর্জি কাপিতানের মহাকাশযানের দিকে। দুটো মহাকাশযান এই কক্ষপথে পাশাপাশি চলতে থাকে। তখন উর্জি ব্লাস্টার গান নিয়ে উঠে পড়ে উদ্ধারকারী মহাকাশযানে এবং সব লুটেপুটে নিয়ে উধাও হয়ে যায় দুস্তর মহাশূন্যে।'

'উর্জি কাপিতানের তেমন কোন খবরাখবর আপনারা বোধ হয় জানতে পারেন নি?'

'পারি নি মানে?' নীরদ সমাদ্দার জোরে হেসে উঠলেন, 'ওর নাড়িনক্ষত্র পর্যন্ত আমরা জানি। ওর পেছনে আমি আজ দু-বছর ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সত্যি, চালাকির ব্যাপারে এ ছায়াপথে ওর কোন জুড়ি নেই।'

এবারে বাবা বললো ঃ জুড়ি থাকবে কি করে? উর্জি কাপিতান যে টেলিপ্যাথি জানে।' তারপর আমার দিকে ফিরে আরও বললো ঃ 'বুঝলে তো, টেলিপ্যাথি-মানে মনের কথা পড়ে ফেলতে পারে উর্জি কাপিতান।'

নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি গোটা শহরটা ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেছে পিছনে। বহির্বিশ্বে বেতার যোগা-যোগের বিশাল একটা অ্যানটেনা প্রায় আমাদের স্পেসক্যাব-এক্স ছুঁয়ে ফেলতে চাইছে। সেদিকে চোখ রেখেই বললাম ঃ 'টেলিপ্যাথি জানলে উর্জি কাপিতানকে ধরা অসম্ভব!'

'হয়তো অসম্ভব' হেসে বললেন নীরদ সমাদ্দার।

বাবা চিন্তিত মুখে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করলেন ঃ 'ওর টেলিপ্যাথিকেই কাজে লাগিয়ে ওকে ধরতে হবে। কিন্তু কি করে?...'

এমন সময় দূরে চোখে পড়লো মহাকাশ-বন্দরের লাল-বাতির নিশান। অসংখ্য ছোট ছোট স্পেসক্যাব বন্দরের আশেপাশে শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। আমাদের হাওয়াগাড়ি এগিয়ে চললো মহাকাশ-বন্দরের দিকে।

বন্দরের নিয়ন্ত্রণ বিভাগে যে মানুষটির সঙ্গে আমরা দেখা করতে গেলাম, তার নাম 'প্রপিতামহ'। আসলে সে একটি আধা-কম্পিউটার ও আধা-মানুষ। সংক্ষেপে কম্পিউম্যান। আমাদের গ্রহের প্রত্যেকটি দায়িত্বপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ পদে একটি করে 'প্রপিতামহ' বহাল করা আছে। সরকারী অনুমতি ছাড়া কেউ 'প্রপিতামহ' তৈরি করতে পারে না। এই 'প্রপিতামহে'র চেহারা হুবহু আমাদের গ্রহের মানুষের মতো, শুধু বুকের ওপর একটা ছোট্ট টিভি স্ক্রীন বসানো। তার কাছে গিয়ে বাবা প্রথমে নিজের দপ্তরের একটা সাংকেতিক সংখ্যা উচ্চারণ করলো। যার অর্থ, শত গোপন খবর হলেও 'প্রপিতামহ' তাকে বলতে পারে। টিভি স্ক্রিন-এ একটা সবুজ আলো জ্বলে উঠলো।

তখন বাবা উর্জি কাপিতানের কাণ্ডকারখানা সংক্ষেপে জানিয়ে বললো ঃ 'আমাদের এই টাইটান গ্রহটা এমন জায়গায়, আর মহাকাশযান জ্বালানীর খরচ এখানে এত কম যে দূরের পথে পাড়ি জমাতে সবাই এখানে এসে আবার জ্বালানী ভরে নেয় মহাকাশযানে। আমরা খবর পেয়েছি, তেরো দিন আগে উর্জি বিটা-7 সেক্টরে একটা মহাকাশযান ছিনতাই করে। সেই মহাকাশযানের কম্পিউটার যে সব তথ্য বেতারে পাঠিয়েছে, তাতে হিসেব কষে দেখা গেছে, ছিনতাইয়ের সময় জ্বালানীর পরিমাণ যা ছিল তাতে উর্জির পক্ষে একমাত্র টাইটানে এসে পৌঁছনোই সম্ভব। যদি সত্যিই সে তাই এসে থাকে, তা হলে গতকাল কিংবা আজ সে এই মহাকাশ-বন্দরে নেমেছে।'

'কি ধরনের মহাকাশযান?'—প্রপিতামহ জিজ্ঞেস করলো।

'ক্লাস টু, যাত্রীবাহী মহাকাশযান'—নীরদ সমাদ্দার বললেন।

এবারের প্রপিতামহের টেলিভিশন পর্দায় শুরু হলো রঙের খেলা। নানান আঁকিবুকি। বুঝলাম, ভেতরে ভেতরে সে হিসেব আরম্ভ করে দিয়েছে।

একটু পরেই সে বললো ঃ 'সিকিওরিটি কন্ট্রোলের মিস্টার সমাদ্দার ছাড়া আর তিনটে ক্লাস টু স্পেসক্র্যাফ্ট্ এখানে নেমেছে। তবে সেগুলো জ্বালানী ভরে এখনও রওনা হতে পারে নি।'

'বাঁচা গেছে।'—নীরদ সমাদ্দার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন ঃ 'ওদের থামাতে হবে। উর্জি কাপিতানকে ফোর্স ফিল্ড দিয়ে বন্দী না করা পর্যন্ত টাইটান ছেড়ে কাউকে যেতে দেওয়া হবে না।'

বাবা বললো, 'একে একে প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসাবাদ

করে দেখা যাক। সেই সঙ্গে ওদের মহাকাশযানগুলোও দেখে নেওয়া যাবে।'

আমার বুকের ভেতরে শুরু হয়ে গেছে দুরু দুরু কাঁপুনি। তিনটে হাওয়াগাড়ির একটাতে রয়েছে কুখ্যাত মহাকাশ-দস্যু উজি কাপিতান। প্রপিতামহ এগিয়ে চললো বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত একটা ঘরের দিকে। নীরদ সমাদ্দার আমার দিকে ফিরে বললেন: 'চলো টুটাবাবু, আকাশ-দস্যু দেখবে চলো।'

আমরা রওনা হলাম।

প্রথমজনকে দেখে মোটেই দস্যু বলে মনে হয় না। বেশ হাসিখুশি চেহারা। নাম ফরচু। লোকটা নাকি গার্ডিনার গ্রহের সেলস্‌ম্যান। সেখানে কয়েক কোটি রকমের ফুলের চাষ হয়। সেগুলোই সে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে বিক্রি করে থাকে। তার মহাকাশযানটিও আকারে ছোটখাটো।

আমি কেবিনের মেঝেতে ধপাস করে বসে পড়লাম। দেখলাম বাবাই প্রথম এগিয়ে গিয়ে কথা শুরু করলো: 'বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। একটা বিশেষ কারণে আমরা সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করছি। আশা করি সহযোগিতা করবেন।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই স্যার।' হেসে গড়িয়ে পড়লো গার্ডিনারের সেলস্‌ম্যান ফরচু।

'শেষ কোন্ গ্রহে আপনি নেমেছিলেন?'

নেবুলেট গ্রহে, স্যার। তবে স্যার, সেখানে ফুলটুল বিশেষ বিক্রি করতে পারি নি, স্যার।'

লক্ষ্য করলাম, যে কোন কথার সামনে পিছনে 'স্যার' যোগ করাটা যেন ফরচু-র মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'আপনার স্পেসশিপের ওঠা-নামা, দূরত্ব, জ্বালানী, কত সময় উড়েছে, এসবের হিসেবের খাতাটা একবার দেখতে পারি?'

'নিশ্চয়ই স্যার, নিশ্চয়ই স্যার।' হন্তদন্ত হয়ে সে ছুটলো 'লগ' বুক নিয়ে আসতে।

লগ বুক বলতে কম্পিউটারে ছাপানো প্রিন্ট আউট। সেগুলো খুঁটিয়ে দেখে হতাশভাবে মাথা নাড়লেন নীরদ সমাদ্দার। অর্থাৎ, সবই ঠিকঠাক রয়েছে।

বাবা বললো: 'গার্ডিনার ও নেবুলেট গ্রহে আপনার বিষয়ে আমরা খোঁজ নেব। সে ক'টা দিন আপনাকে টাইটান ছেড়ে যেতে দেওয়া হবে না। এভাবে অসুবিধেয় ফেলতে খুব খারাপ লাগছে, তবে—'

'না, না, স্যার, একটুও বিব্রত হবেন না। বরং সে ক'দিনে এই গ্রহটা আমি একটু ঘুরে ফিরে দেখে নেব।' —কথা শেষ করে মোলায়েম হাসি হাসলো ফরচু।

আমরা বেরিয়ে এলাম তার উড়োজাহাজ ছেড়ে। রওনা হলাম দ্বিতীয় মহাকাশযান লক্ষ্য করে। যেতে যেতে নীরদ সমাদ্দার বললেন: 'কি মনে হলো সার্জেণ্ট কুকা? লোকটা টেলিপ্যাথি জানে?'

'বোধ হয় না। কারণ লগবুকটা নিয়ে আসতে বলার আগে আমি মনে মনে ওটা চেক করার ইচ্ছেটা ভেবেছিলাম। লোকটা টেলিপ্যাথি জানলে নিশ্চয়ই মুখে উচ্চারণ করার আগেই লগ বুকটা নিয়ে এসে নিজেকে নিপাট ভালোমানুষ প্রমাণ করত—'

'তার মানে ফরচু উজি কাপিতান নয়?' আমি উৎসাহ নিয়ে প্রশ্ন করলাম।

বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো: 'কে জানে। হয়তো আমার মতলব বুঝতে পেরেই সে টেলিপ্যাথি না জানার ভান করেছে। কারণ উজি কাপিতান আর যাই হোক বোকা নয়।'

'ঐ যে, দু-নম্বর স্পেসশিপ—' নীরদ সমাদ্দার আঙুল তুলে দেখালেন।

দ্বিতীয় মহাকাশযানটির রঙ ঘোর লাল, তার ওপরে সাদা ডোরাকাটা। ইঞ্জিন, জেনারেটর, সব কিছুই প্রয়োজনের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। হয়তো প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে উড়তে পারে। আগাপাস্তলা কার্পেটে মোড়া একটি ঘরে বসেছিলো জাহাজের মালিক। বয়েসে আমার চেয়ে সামান্য বড়। বসে বসে একটা ইলেকট্রনিক বাঁশিতে সুর তুলছে।

আমাদের দেখেই সে বললো: 'আসুন, বসুন, কি খাবেন বলুন—'

কথা বলার ভঙ্গী এমন উদ্ধত যে মনে হয় কোন প্রতিপত্তিশালী লোকের বখে যাওয়া আদুরে খোকা।

'আমরা নেহাৎই নিয়মমাফিক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসেছি—' বাবা ধীরে ধীরে বললো। বুঝলাম, নিজেকে বহু কষ্টে সংযত করছে।

'আমার নাম সি। ছায়াপথে এমনি বেড়াতে বেরিয়েছি আর আপন মনে ফূর্তি করছি।' বলে আবার সে বাঁশি বাজাতে লাগলো।

'শেষ কোন্ গ্রহে নেমেছিলে?'

'ভুলে গেছি। কম্পিউটারকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।'

নীরদ সমাদ্দার অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন,—'তেরোদিন আগে বিটা-7 সেক্টর থেকে তুমি কোন স্পেসশিপ ছিনতাই করেছ?'

ছেলেটা উত্তর না দিয়ে আপন মনে বাঁশি বাজাতে লাগলো। বাবা ততক্ষণে কম্পিউটারে নানান বোতাম টিপে খবরাখবর সব বের করে নিয়েছে। সি-র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে বাবা নীরদ সমাদ্দারকে বললো ঃ 'তেরোদিন আগে ছেলেটা পাই গ্রহের একটা ফাংশানে হাজির ছিল। ওর কম্পিউটার স্টোরেজে জায়গার নাম, তারিখ ও সময় লেখা কম করেও তিরিশটা ফটোগ্রাফ রয়েছে। সুতরাং সি উজি কাপিতান নয়।'

নীরদ সমাদ্দার বিরক্তভাবে বললেন ঃ 'উজি কাপিতানকে তা হলে কোথায় খুঁজি ?'

তাঁর কথায় উজি ও খুঁজি শব্দ দুটোর মিল শুনে আমার রীতিমতো হাসি পেয়ে গেল।

তিন নম্বর মহাকাশযানটি পুরোনো। উল্কাপাতের আঘাতে বেঁকে চুরে তুবড়ে গেছে। কোথাও কোথাও সামান্য মরচেও ধরেছে। ভিতরে ঢুকতেই নাকে এলো একটা উৎকট গন্ধ। পুরোনো জিনিসে ছাতা ধরলে যে ধরনের গন্ধ হয়।

মহাকাশযানের মালিকের নাম লিপো চেন। হাতে সাতটা করে আঙুল। ভুরু নেই। চেহারায় বেঁটেখাটো। পেশায় হীরে জহরতের ব্যবসায়ী। সে মাইক্রোওয়েভ কুকারে কি যেন একটা গরম করছিল, বাবার মুখে জিজ্ঞাসাবাদের কথা শুনে রাগে ফেটে পড়লো। অদ্ভুত মিহি গলায় বলে উঠলো ঃ 'এসব নিয়মমাফিক জিজ্ঞাসাবাদ ছেড়ে আপনারা কাজের কাজ করুন দেখি! লুঠেরা উজি কাপিতানকে ধরবার চেষ্টা করুন। শয়তানটা গত মাসে আমার কাছ থেকে সুপ্রীম গ্যালাকটিকা হীরেটা ছিনতাই করেছে। ওটা ছিল এই ছায়াপথের সেরা হীরে।'

বাবা ও নীরদ সমাদ্দারের মধ্যে চোখাচোখি হলো। অর্থাৎ, এটা লিপো চেন—অথবা উজি কাপিতানের কোন চালাকি নয় তো—যাতে নিজের ওপর থেকে সন্দেহ মুছে ফেলা যায় ?

'হীরেটা কোত্থেকে পেয়েছিলেন ?'—বাবা জানতে চাইলো।

'আমাদের ছায়াপথ পেরিয়ে একটা মৃত নক্ষত্রের কক্ষপথ থেকে ওটা আমি হঠাৎই খুঁজে পেয়েছি। হীরে তো নয়, যেন বিশাল এক উল্কাপিণ্ড! যে কোনভাবেই হোক, তিন হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ও আকস্মিক চাপে ময়সাঁ পদ্ধতিতে কোন কাঠকয়লার বিশাল পিণ্ড হয়ে গেছে হীরের টুকরো। ওটা এত প্রকাণ্ড যে মহাকাশযানে না তুলে জিরকোনিয়া শেকল দিয়ে বেঁধে নিয়েছিলাম এই স্পেসশিপের সঙ্গে। নেহাৎ উজি কাপিতানের খপ্পরে না পড়লে আমি আজ ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে রাজার হালে থাকতে পারতাম—'

লিপো চেন-কে প্রশ্ন করে জানা গেল, সে এক অজানা বিপদ সঙ্কেতে সাড়া দিয়ে সাহায্যের জন্যে এগোয়, এবং সরাসরি উজি কাপিতানের কব্জায় গিয়ে পড়ে। তার মহাকাশযানটা ছিল ক্লাস-টু, যাত্রীবাহী। না, উজি কাপিতানকে সে দেখতে পায় নি। যদি কোন দিন তাকে বাগে পায় তা হলে—

'একদিন না একদিন সে ধরা পড়বেই।' নীরদ সমাদ্দার হেসে বললেন।

'আপনারা আর ধরেছেন!' ব্যঙ্গের সুরে বললো লিপো চেন।

সে কথায় আমল না দিয়ে বাবা নিয়মমাফিক জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলো। কম্পিউটারের ডেটা চেক করে দেখলো। প্রিন্টআউট নিলো। লিপো বললো যে, সে তেরোদিন আগে মহাকাশের পথে উড়ে বেড়াচ্ছিল। গত পরশু তার পাওয়ার ইউনিট জবাব দেওয়ায় সে বাধ্য হয়ে মহাকাশযান মেরামতের জন্যে টাইটানে নেমে পড়েছে। নইলে—

'আপাতত আপনি টাইটান ছেড়ে যাবেন না। আমরা দরকার হলে পরে আপনার সঙ্গে আবার কথা বলব।' নীরদ সমাদ্দার বাবার দিকে তাকিয়ে একটা হতাশ ভঙ্গী করলো। তারপর আমরা তিনজন আবার রওনা হয়ে পড়লাম লিপো চেন-এর স্পেসশিপ ছেড়ে।

'উজি কাপিতানকে ধরা অতো সহজ নয়।' আমি মুচকি হেসে বাবাকে বললাম।

বাবার মুখে ঘন দুশ্চিন্তার ছাপ। হয়তো সেই কারণেই আমার কথায় কোন উত্তর দিলো না। যেন শুনতেই পায় নি।

বাড়িতে ফিরে বাবার সঙ্গে বসে ইলেকট্রনিক দাবা খেলতে বসলাম।

বাবার সঙ্গে বেরিয়েছিলাম বলে মা একপ্রস্থ বকাবকি করলো। বাবার দেখলাম খেলাতে একটুও মন নেই। বারবার আমার কাছে কিস্তিমাৎ হয়ে যাচ্ছে। একটু পরেই রেডিও ফটোগ্রাম-এ নিরাপত্তা-বাহিনীর একজন সার্জেন্টকে দেখা গেল। সে জানালো যে বাবার দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে সবরকম খোঁজখবর তারা নিয়েছে এবং ফরচু, সি ও লিপো চেন একটিও মিথ্যে কথা বলেনি। সুতরাং তারা কেউই সম্ভবতঃ উজি কাপিতান নয়।

খবরটা শুনে বাবা দাবা ছেড়ে উঠে পড়লো। মাকে বললো, 'রাতে কিছু খাবো না, শুয়ে পড়ছি।'

মা আমাকে খেতে দেবার সময় বিরক্তভাবে বললো : পুলিশগুলোর যে কখন কি ভূত মাথায় চাপে কে জানে।'

বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে গেল।

ভোরবেলা উঠেই দেখি বাবা নিরুদ্দেশ। কোথায় গেছে সেটা মা ঠিকমতো বলতে পারলো না। কিন্তু আমি বুঝলাম, বাবা উজি কাপিতানের খোঁজেই বেরিয়েছে আমাকে সঙ্গে নেয় নি বলে মনে মনে আমার ভীষণ রাগ হলো। তবে নীরদ সমাদ্দার কোন হোটেলে উঠেছেন সেটা গতকালই শুনেছি। তাঁর কাছে গেলে নিশ্চয়ই বাবার দেখা পাব, এই ভেবে মাকে বললাম : 'বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি? একটু পরে ফিরবো।

উত্তরে মা বললো ; 'বাবা-ছেলে, দুই-ই সমান।'

কিন্তু আমি তখন উজি কাপিতান রহস্যের অংশীদার হবার জন্যে যেন উত্তেজনায় যেন ভেসে চলেছি।

একটা হোভারবাস ধরে নীরদ সমাদ্দারের হোটেলে পৌঁছুলাম। লবিতে তাঁর সঙ্গে দেখা হলো। আমাকে দেখেই তিনি মজার হেসে বললেন ; কি টুটাবাবু, কি খবর? উজি কাপিতানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছ নাকি?'

'বাবা সেই সক্কালে বেরিয়ে পড়েছে। তাই ভাবলাম, আপনার সঙ্গেই নিরাপত্তা বাহিনীর দপ্তরে যাব।' তাঁকে আরো বললাম, তিন মহাকাশযাত্রীই সন্দেহ থেকে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু উত্তেরে নীরদ সমাদ্দার আমাকে অবাক করে দিলেন। বললেন 'সার্জেন্ট কুকার কাছ থেকে একটু আগেই খবর এসেছে। মহাকাশ বন্দরে গিয়ে ঐ তিনজনকে হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যেতে হবে আরো জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে। তুমিও চলো তা হলে আমার সঙ্গে—'

স্পেসক্যাব-এক্স-এ চড়ে রওনা দেবার সময় নীরদ সমাদ্দার বললেন, 'তোমার বাবা ঐ লোকগুলোকে আবার কেন জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান জানো?'

'না জানি না। তবে বাবা যখন এইরকম হুটহাট করে বেপাত্তা হয়ে যায়, তখনই বুঝে নিতে হয় রহস্যের সমাধান একেবারে বাবার হাতের মুঠোয় এসে গেছে।

এমন সময় আমাদের চেখে পড়লো দূরে মহাকাশ বন্দরের লালবাতির নিশান।

কিছুক্ষণ পর প্রপিতামহের সহযোগিতায় একটা বড়সড় স্পেশক্যাব-এ চড়ে আমরা পাঁচজন উড়ে চললাম নিরাপত্তা বাহিনীর দপ্তরের দিকে। সি আপনমনে বাঁশি বাজাচ্ছে। লিপো চেন বিরক্ত হয়ে বললোঃ 'উজি কাপিতানকে ধরতে পারলে বুঝতাম আপনাদের কেরামতি।' আর ফরচু শুধু হাত কচলাচ্ছে আর বলছেঃ 'সামান্য, স্যার, সেলসমেনের কপাল একি দুর্গতি, স্যার।'

এক সময় নিচে দেখা গেল নিরাপত্তা দপ্তরের হোভার-প্যাড। আমরা নিঃশব্দে নেমে পড়লাম ছাদে।

ছাদটা আকারে বিশাল। আশপাশের অন্যান্য বাড়ি-গুলো খুব নিচু হওয়ায় কেমন যেন ভয় ভয় করে। আমরা ছাড়া ছাদে আর মাত্র একজন মানুষ রয়েছেন। তাঁকে দেখা গেল ছাদের সবচেয়ে দূরের প্রান্তে বিপজ্জনকভাবে হুইল চেয়ারে বসে থাকতে। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে একজন বৃদ্ধ। কিন্তু কে ইনি?

'ভদ্রলোক যে এখুনি পড়ে যাবেন, স্যার।' ফরচু উত্তেজিতভাবে বলে উঠলো

'হয়তো হুইল চেয়ারটা কোন স্পেসক্যাব।' সি ঠাট্টা করে বললো!

লিপো চেন হয়তো কিছু বলতে যাচ্ছিলো, এমন সময় অঘটনটা ঘটলো।

একটা দমকা বাতাস দিতেই হুইল চেয়ারটা ছাদের কিনারার দিকে গড়িয়ে চললো, ছাদে কোন পাঁচিল নেই। ফলে বৃদ্ধ ভদ্রলোক নির্ঘাৎ পড়ে যাবেন ছাদ থেকে। তারপর দুশো সাতচল্লিশ তলা নিচে পড়লে একেবারে—

হঠাৎই লিপো যেন চীৎকার করে উঠলো, তারপর ছুট লাগালো হুইল চেয়ার লক্ষ্য করে। আমরাও ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম। একমাত্র নীরদ সমাদ্দার মজা করে হেসে বললেন 'ভয় নেই। একটুও ঘাবড়াবেন না। ওটা মানুষ নয়। একটা মূর্তি—আপনাদের ঠকানোর জন্যে রাখা হয়েছে—'

নীরদ সমাদ্দারের কথা শেষ হতে না হতেই আমাদের পেছন থেকে একটা চেনা গলা ভেসে এলো ; ওঁদের ঠকানোর জন্যে মোটেই নয়, সমাদ্দার। মূর্তিটা রাখা হয়েছে আপনাকে ঠকানোর জন্য। উজি কাপিতানকে হাতেনাতে ধরবার জন্যে।

তাকিয়ে দেখি বাবা কোত্থেকে যেন ছাদে এসে হাজির হয়েছে। হাতে উদ্যত ব্লাস্টার গান। আর বাবার পাশে উনি কে? এ যে দ্বিতীয় নীরদ সমাদ্দার। তাঁরও হাতে অটোমেটিক ব্লাস্টার। উঁচিয়ে আছেন প্রথম নীরদ সমাদ্দারকে লক্ষ্য করে।

প্রথম নীরদ সমাদ্দার মাথার পরচুলাটা একটানে খুলে ফেললো। তারপর কখন যে সে নিজের ব্লাস্টার বের করে নিয়েছে খেয়ালই করি নি। খেয়াল যখন হলো তখন সে আমাকে একহাতে জাপটে ফেলেছে, আর অন্য হাতে ধরা ব্লাস্টারের নলটা ঠেকিয়েছে আমার মাথায়। চিৎকার

করে সে বললো ; 'কুকা, ব্লাস্টার ফেলে দাও। নইলে তোমার ছেলেকে পারমাণবিক ধুলো বানিয়ে ছাড়বো।

তখন সে আমাকে জাপটে ধরেছে

বাবা কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। আসল নীরদ সমাদ্দারও বিহ্বল, হতবাক।

হঠাৎই লিপো চেন ঝাঁপিয়ে পড়লো নকল নীরদ সমাদ্দারের ওপর। গর্জন করে উঠলো : 'উজি কাপিতান আমার সুপ্রিম গ্যালিকাটিকা ফেরৎ দে, শয়তান!

উজি কাপিতান লিপোর দিকে ফিরতেই তার মাথাটা হঠাৎই অদৃশ্য হয়ে গেলো। আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। তাকিয়ে দেখি বাবার ব্লাস্টার থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। পলকের সুযোগে উজি কাপিতানকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে বাবা। আমি ছুটে এসে বাবাকে জাপটে ধরলাম। ফরচু কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠলো,' 'আপনি স্যার প্রাণদাতা, স্যার। অনেক ধন্যবাদ স্যার।"

সি এতোক্ষণে বাঁশির কথা ভুলে গিয়েছিল, এখন আবার বাজাতে শুরু করেছে।

লিপো চেন বিরক্তভাবে বাবাকে বললোঃ 'আপনার আবার ব্লাস্টার চালাবার কি দরকার ছিল? আমি ওর থেকে হীরের খবরটা আদায় করে ছাড়তাম।

বাবা রুক্ষভাবে জবাব দিলে : "আপনার হীরের চেয়ে আমার এই হীরেটার দাম অনেক বেশী! তারপর আমার মাথায় হাত বোলাতে লাগলো। আনন্দে আমি ডুকরে কেঁদে উঠলাম।

পরে বাবার কাছে জেনেছি, হুইল চেয়ারে বসানো মূর্তিটাকে দেখে কি করে নীরদ সমাদ্দার বুঝতে পেরেছিল ওটা সত্যিকারের মানুষ নয়। আসলে টেলিপ্যাথি জানা থাকায় মূর্তিটার যে কোন মন নেই সেটা নীরদ সমাদ্দার, অর্থাৎ উজি কাপিতান, সঙ্গে সঙ্গেই টের পেয়েছিল। পৃথিবীর সিকিওরিটি কণ্ট্রোলের দপ্তরে নীরদ সমাদ্দারের খোঁজ করতে গিয়ে বাবা প্রথম ব্যাপারটা ধরতে পারে। কারণ আসল নীরদ সমাদ্দার তখনো পৃথিবী ছেড়ে রওনা হয় নি।

উজি কপিতান বুঝেছিল তার ধরা পড়ার দিন ঘনিয়ে আসছে। তাই পরিকল্পনা করেছিল পুলিশের লোক সেজে পুলিসের দপ্তরে ঢুকে চিরকালের জন্যে গা-ঢাকা দিতো সেই কাজের জন্যে মোটামুটি চেহারার মিল দেখে সে সিকিউরিটি কণ্ট্রোলের নীরদ সমাদ্দারকে বেছে নিয়েছিল। আজকালের মধ্যেই সে আসল সমাদ্দারকে ব্লাস্টার দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে নিজের গা ঢাকা দেবার জায়গা পাকা-পাকি করে নিত। আর সেই ফাঁকে পুলিশ তার সম্পর্কে কতটুকু খোঁজখবর রাখে তাও জেনে ফেলত এখানকার নিরাপত্তা দপ্তর থেকে।

সে রাতে দাবা খেলতে বসে বাবার কাছে বারবার হেরে গেলাম। হঠাৎ বাবা বললো, 'টুটা, তোমার মাকে বল তো এক কাপ কফি করে দিতে।'

সঙ্গে সঙ্গেই দেখি মা এক কাপ কফি নিয়ে ঘরে ঢুকছে।

আমি মুচকি হেসে বললাম : 'টেলিপ্যাথি!'

আর বাবা হো হো করে হেসে উঠলো।

বিজ্ঞান কলেজ, কলকাতা-9

ম্যাজিক স্কোয়ার

গৌরীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

গণিতের ইতিহাসে সংখ্যাবিজ্ঞান ঐতিহ্যমণ্ডিত সম্ভ্রম-জাগানো একটি বিশেষ শাখা। গণিতের লৌকিক চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট এই প্রাচীনতম শাখাটির আকর্ষণী শক্তির মোহে পৃথিবীর প্রথম সারির বহু গণিতবিদ বহু বৎসর গাণিতিক ধ্যানধারণায় অতিবাহিত করেছিলেন। সাফল্যলাভ সবার ভাগ্যে না-ঘটলেও এই শাখায় চমক বেড়েছে বই কমে নি।

সংখ্যাবিজ্ঞান প্রাথমিকভাবে নির্ভরশীল 1 থেকে 9 পর্যন্ত সংখ্যার উপর। এদের নিয়ে কত ধাঁধাঁ, সঙ্কেত, গল্প, রহস্যের ছড়াছড়ি। এমনই একটি হলো ম্যাজিক স্কোয়ার। ম্যাজিক স্কোয়ার বলতে বোঝায় একটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বর্গক্ষেত্র যা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বর্গাকার প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। এই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠগুলিকে এমন সব সংখ্যা দ্বারা পূর্ণ করা হয় যাদের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং কর্ণ বরাবর যোগ করলে যোগফল সর্বক্ষেত্রেই এক থাকে। একটি ম্যাজিক স্কোয়ারের ক্ষেত্রফলের সংখ্যা দ্বারা তার ক্ষুদ্র বর্গাকার প্রকোষ্ঠের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। যেমন 2×2, 3×3, 4×4 মাপের ম্যাজিক স্কোয়ারে বর্গাকার প্রকোষ্ঠের সংখ্যা হবে যথাক্রমে 4, 9 এবং 16।

ম্যাজিক স্কোয়ার গঠনের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। কয়েকটি সহজ পদ্ধতির কথা লিখছি।

(1) প্রথমে 4×4 মাপের একটি ম্যাজিক স্কোয়ার গঠনের কথা বলা হলো। মনে করা যাক্ প্রথম 16 টি অখণ্ড সংখ্যা দ্বারা বর্গাকার প্রকোষ্ঠগুলি পূর্ণ করা হলো। এখানে যা করণীয় তা হলো প্রথমে 1 থেকে 16 পর্যন্ত সংখ্যাগুলিকে দৈর্ঘ্য বরাবর উপরের প্রথম সারির প্রথম প্রকোষ্ঠ থেকে শুরু করে বাম থেকে ডানদিকে ক্ষুদ্র বর্গাকার প্রকোষ্ঠে রাখা হলো (চিত্র 1a)। এবার কর্ণ বরাবর সংখ্যাগুলিকে বিপরীত দিকে বসানো হলো (চিত্র 1b)। A___B সরল রেখাকে ঘুরিয়ে যে উপায়ে B___A করা হয়। চিত্র (1b) হলো নির্ণেয় ম্যাজিক স্কোয়ার।

4 দ্বারা বিভাজ্য এরূপ ম্যাজিক স্কোয়ার (যেমন 4×4, 8×8, 12×12 ইত্যাদি)

প্রথমে 4×4 মাপের একটি বর্গাকার অংশ নেওয়া হলো। এবার * চিহ্ন দ্বারা কর্ণ বরাবর প্রকোষ্ঠগুলিকে পূর্ণ করা হলো (চিত্র 2a)। ধরা যাক্ 1 থেকে 16 সংখ্যাগুলি দ্বারা (যতগুলি সম্ভব) উপর থেকে নিচের সারি বরাবর বাকি প্রকোষ্ঠগুলি পূর্ণ করা হলো (* চিহ্ন বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠগুলিকে উহ্য রাখতে হবে, চিত্র, 2b)। এবার ডানপ্রান্তের সর্বনিম্ন প্রকোষ্ঠ থেকে শুরু করে ডানদিক থেকে বামদিক বরাবর 1 থেকে 16 দ্বারা (যতগুলি সম্ভব) * চিহ্নিত প্রকোষ্ঠগুলি পূর্ণ করা হলো, চিত্র (2c)।

চিত্র (2c) হলো নির্ণেয় ম্যাজিক স্কোয়ার।

যুগ্ম বা জোড় ম্যাজিক স্কোয়ার :

মনে করা যাক্ 6×6 মাপের একটি ম্যাজিক স্কোয়ার তৈরি করতে হবে। 1 থেকে 36 পর্যন্ত সংখ্যাগুলিকে প্রথমে 6 টি সমান সারিতে উপর থেকে নিচে বসিয়ে একটি 6×6 স্কোয়ার তৈরি করা হলো (চিত্র 3a)। এখন প্রথম সারির তিনটি সংখ্যার সঙ্গে ষষ্ঠসারির তিনটি সংখ্যার স্থানবিনিময় করা হলো। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সারির তিনটি সংখ্যার সঙ্গে যথাক্রমে পঞ্চম ও চতুর্থ সারির সংখ্যাগুলির স্থান বিনিময় করা হলো (চিত্র 3b)। এইবার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দণ্ডের তিনটি সংখ্যাকে অনুরূপভাবে যথাক্রমে ষষ্ঠ, পঞ্চম ও চতুর্থ দণ্ডের তিনটি সংখ্যার সঙ্গে স্থানবিনিময় করা হলো। তবে এক্ষেত্রে যে কোন তিনটি সংখ্যা নেওয়া চলবে না। তিনটি সংখ্যার দুইটি কর্ণের উপরিস্থিত হবে, তৃতীয়টি এরূপ হবে, যার ইতিপূর্বে স্থান পরিবর্তন হয় নি। চিত্রে (3c) হলো নির্ণেয় ম্যাজিক স্কোয়ার।

অযুগ্ম বা বিজোড় ম্যাজিক স্কোয়ার
(ডায়মণ্ড ম্যাজিক স্কোয়ার পদ্ধতি)

ধরা যাক্ 1 থেকে 9 পর্যন্ত সংখ্যা দ্বারা 3×3 মাপের একটি ম্যাজিক স্কোয়ার তৈরি করতে হবে। এবার যা করতে হবে তা হলো :

1, 2, 3 ;   4, 5, 6 ;   7, 8, 9,

সংখ্যাগুলিকে সমদূরত্ব বজায় রেখে তিনটি সারিতে রাখা হলো। এবার সংখ্যাগুলিকে

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

1 A

16	2	3	13
5	11	10	8
9	7	6	12
4	14	15	1

1 B

ছোট ছোট সমমাপের বর্গাকার বেষ্টনী দ্বারা ঘিরে ফেলে চিত্রে মাঝবরাবর যে বর্গাকার অংশটি পাওয়া গেল তাকে নির্দিষ্ট করা হলো। একে বলে সেণ্ট্রাল স্কোয়ার ডায়মণ্ড। এটি একটি 3 × 3 মাপের ম্যাজিক স্কোয়ার (চিত্র 4a)। এর শূন্য প্রকোষ্ঠগুলি পূর্ণ করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে নির্দিষ্ট শূন্য প্রকোষ্ঠের নিকটবর্তী যে সংখ্যাটি সেণ্ট্রাল স্কোয়ার ডায়মণ্ডের বাইরে থাকবে সেই সারি বরাবর সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী সংখ্যাটিকে ঐ শূন্য প্রকোষ্ঠে রাখতে হবে। চিত্রে (4b) হলো নির্ণেয় ম্যাজিক স্কোয়ার।

*			*
	*	*	
	*	*	
*			*

2 A

*	1	2	*
3	*	*	4
5	*	*	6
*	7	8	*

2 B

8	1	2	7
3	6	5	4
5	4	3	6
2	7	8	1

2 C

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36

3 A

31	32	33	4	5	6
25	26	27	10	11	12
19	20	21	16	17	18
13	14	15	22	23	24
7	8	9	28	29	30
1	2	3	34	35	36

3 B

6	32	33	4	5	31
12	11	10	27	26	25
19	17	16	21	20	18
13	14	22	15	23	24
7	29	28	9	8	30
36	2	3	34	35	1

3 C

		3		
	2		6	
1		5		9
	4		8	
		7		

4A

2	7	6
9	5	1
4	3	8

4B

সহজ কথায় রসায়ন [সাত]

ধাতুর কথা

অমরনাথ রায়

রোজকার জীবনে আমরা হরেকরকম ধাতু নির্মিত সামগ্রী ব্যবহার করে থাকি। তামার তার, ইস্পাতের ছুরি কাঁচি, লোহার পেরেক ও রড, দস্তা-লিপ্ত লোহা দিয়ে তৈরি বালতি, অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র, অ্যালুমিনিয়াম চূর্ণ দিয়ে তৈরি সাদা রঙ, বাজি তৈরির জন্যে ম্যাগনেসিয়াম চূর্ণ প্রভৃতি জিনিস হামেশাই আমাদের ব্যবহার করতে হয়। কাজেই লোহা, তামা, দস্তা, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি ধাতুগুলির সঙ্গে আমাদের মোটামুটি পরিচয় থাকা দরকার। সেজন্যে স্কুলে মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে লেখা ভৌত-বিজ্ঞান বইতে একটি অধ্যায়ে এই সব ধাতুর উৎস ধর্ম ও ব্যবহার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের সেই অধ্যায়টি পড়তে হয়।

ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেরই প্রবল অনুসন্ধিৎসা থাকে। বইতে যা লেখা আছে, তার অতিরিক্ত কিছু তারা জানতে চায়। তাদের কৌতূহল যথাসম্ভব নিবৃত্ত করা উচিত। ধাতুর উৎস, ধর্ম ও ব্যবহার ছাড়া আরও অনেক কিছু জানার আছে। যতটুকু তাদের জানা আছে, তা যাচাই করার জন্যে এবং যেটুকু জানা নেই তা জানিয়ে দেবার জন্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রথমে আসা যাক্ সেই সব কথায়, যা মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের জানা নেই, অথচ জানবার ইচ্ছে আছে। সোনা, প্লাটিনাম প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুকে প্রকৃতিতে পাওয়া যায় মুক্ত অবস্থায়, কিন্তু বেশির ভাগ ধাতুই প্রকৃতিতে থাকে যৌগরূপে। এইসব ধাতব যৌগ কখনও মাটির নিচে পাথরের মতো কঠিন অবস্থায় থাকে, আবার কখনও বা ঐরূপে মাটির উপরে থাকে। এই সব প্রাকৃতিক ধাতব যৌগগুলিকে আমরা বলে থাকি 'খনিজ', ইংরেজিতে mineral. খনিজ পদার্থের মধ্যে আসল পদার্থটি ছাড়াও মাটি, বালি কাদা ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় পদার্থ মিশে থাকে। অপ্রয়োজনীয় এইসব পদার্থকে বলা হয় 'খনিজ মল', ইংরেজিতে Gangue. খনিজের মধ্যে আসল পদার্থটির চেয়ে অপ্রয়োজনীয় পদার্থই কিন্তু বেশি থাকে।

সব খনিজ থেকে ধাতু নিষ্কাশন করা সম্ভব হয় না, হলেও খরচ খুব বেশি পড়ে যায়। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বোঝা সহজ হবে। অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর গোটা সাতেক খনিজ আছে। তাদের মধ্যে বক্সাইট এবং ক্রায়োলাইট নামক খনিজ থেকে অ্যালুমিনিয়াম ধাতুকে সহজে ও সুলভে নিষ্কাশন করা যায়। অ্যালুমিনিয়ামের খনিজের সংখ্যা সাতটি হলেও আকরিক বা ইংরেজিতে Ore-এর সংখ্যা কিন্তু মাত্র দু'টি—বক্সাইট এবং ক্রায়োলাইট। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, কোন ধাতুর অনেকগুলি খনিজ থাকলেও আকরিকের সংখ্যা একটি বা দুটিই হয়ে থাকে। যে সব খনিজ থেকে সহজে ও সুলভে ধাতু নিষ্কাশন করা যায়, তাদের ঐ ধাতুর আকরিক (ore) বলে। আর আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন করার পদ্ধতিকে বলা হয় ধাতুবিজ্ঞান, ইংরেজিতে Metallurgy ।

আকরিকের সঙ্গে অনেক রকম অশুদ্ধি থাকে। সেজন্যে প্রথমেই নানা প্রক্রিয়ায় আকরিককে যতদূর সম্ভব অশুদ্ধিমুক্ত করে নিতে হয়। এর ফলে আকরিকের মধ্যে ধাতুর শতাংশিক পরিমাণ বেড়ে যায়। অশুদ্ধি দূর করার প্রক্রিয়াকে ধাতুবিদ্যায় 'গাঢ়ীকরণ' বলা হয়। গাঢ়ীকরণের পর কোন কোন ধাতুর আকরিককে ভস্মীকরণ, তাপজারণ ও বিগলন পদ্ধতিতে ধাতুতে পরিণত করা হয়। এ ভিন্ন কার্বন বিজারণ পদ্ধতি ও স্বতঃবিজারণ পদ্ধতিতেও কোন কোন ধাতুর আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন করা হয়। আবার সোডিয়াম, পটাসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি তীব্র তড়িৎ-ধনাত্মক ধাতুগুলিকে এদের আকরিক থেকে তড়িৎবিশ্লেষণ পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা হয়।

ধাতু নিষ্কাশন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে তাপজারণ, ভস্মীকরণ, বিগলন প্রভৃতি প্রক্রিয়াগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্যে নানারকম চুল্লী ব্যবহার করা হয়। এই সব চুল্লীর নাম আলাদা, চেহারাও আলাদা। পরাবর্ত চুল্লী, মারুত চুল্লী, সংবর্ত চুল্লী ও বৈদ্যুতিক চুল্লী বিভিন্ন ধাতু নিষ্কাশনে ব্যবহৃত হয়। এক একটি ধাতু নিষ্কাশনে এদের মধ্যে একটি, কখনও বা একাধিক চুল্লীর প্রয়োজন হয়।

এবারে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে নিজেই যাচাই করে নাও—কতটা শিখতে পেরেছ। উত্তর ঠিক হলো কিনা তা সমাধানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নাও।

1. নিচে কয়েকটি খনিজের নাম লেখা আছে। এগুলির মধ্যে কোন্‌টি অ্যালুমিনিয়ামের প্রধান উৎস ?

(ক) লিমোনাইট (খ) বক্সাইট (গ) ফেলস্পার (ঘ) জিবসাইট।

2. ফটোগ্রাফির ফ্লাশ বাল্ব-এ নিচের কোন্ ধাতুটি ব্যবহৃত হয় ?
(ক) আয়রন (খ) অ্যালুমিনিয়াম (গ) ম্যাগনেসিয়াম (ঘ) জিংক।

3. নিচের কোন্‌টি 'দার্শনিকের উল' নামে পরিচিত ?
(ক) জিংক অক্সাইড (খ) ফেরোসো ফেরিক অক্সাইড (গ) ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড (ঘ) অ্যালুমিনিয়াম নাইট্রাইড।

4. নিচের খনিজগুলির মধ্যে কোন্‌টি আয়রনের আকরিক ?
(ক) উইলেমাইট (খ) ম্যালাকোনাইট (গ) চালকোপাইরাইট (ঘ) হিমাটাইট।

5. গ্যালভানাইজেশন-এর কাজে কোন্ ধাতুর প্রয়োজন হয় ?
(ক) জিংক (খ) আয়রন (গ) অ্যালুমিনিয়াম (ঘ) ম্যাগনেসিয়াম।

6. প্রাণিদেহের রক্তের লালকণিকায় কোন্ ধাতুঘটিত যৌগ বর্তমান ?
(ক) জিংক (খ) অ্যালুমিনিয়াম (গ) আয়রন (ঘ) ম্যাগনেসিয়াম।

7. পিতল (Brass) প্রস্তুতিতে নিচের কোন ধাতুটির প্রয়োজন হয় না ?
(ক) কপার (খ) জিংক (গ) অ্যালুমিনিয়াম।

8. 'জার্মান সিলভার'-এ নিচের কোন্ ধাতুটি আদৌ থাকে না ?
(ক) সিলভার (খ) কপার (গ) জিংক (ঘ) নিকেল।

9. ঘণ্টা তৈরী হয় কোন্ সংকর ধাতু দিয়ে ?
(ক) ম্যাগনেসিয়াম (খ) ব্রোঞ্জ (গ) কাঁসা (ঘ) পিতল।

10. নিচের কোন্‌টিতে কার্বনের পরিমাণ সবচেয়ে কম ?
(ক) লোহা (খ) রট আয়রন (গ) কাস্ট আয়রন।

11. নিচের ধাতুগুলির মধ্যে কোন্‌টির গলনাংক সবচেয়ে কম ?
(ক) লোহা (খ) তামা (গ) অ্যালুমিনিয়াম (ঘ) জিংক।

12. রূপালী প্যাকিং কাগজ তৈরি হয় কোন্ ধাতু দিয়ে ?
(ক) ম্যাগনেসিয়াম (খ) আয়রন (গ) অ্যালুমিনিয়াম (গ) জিংক।

13. নিচের ধাতুগুলির মধ্যে কোন্‌টি সবচেয়ে হাল্কা ?
(ক) অ্যালুমিনিয়াম (খ) ম্যাগনেসিয়াম (গ) আয়রন (ঘ) কপার।

14. একটি খনিজ পদার্থের রাসায়নিক সংকেত $MgCO_3$, $CaCO_3$. ঐ খনিজ পদার্থের নাম কি ?
(ক) কাইনাইট (খ) কার্নালাইট (গ) চালকেসাইট (ঘ) ডলোমাইট।

15. নিচের কোন্ যৌগটির নাম ফেরোসোফেরিক অক্সাইড ?
(ক) Fe_2O_3 (খ) Fe_3O_4 (গ) $2Fe_2O_3.3H_2O$

16. নিচের কোন্ ধাতুটি প্রকৃতিতে মৌলাবস্থায় অতি সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায় ?
(ক) কপার (খ) আয়রন (গ) ম্যাগনেসিয়াম (ঘ) জিংক।

17. লোহা নিষ্কাশনের জন্যে সাধারণত কোন্ চুল্লী ব্যবহৃত হয় ?
(ক) মারুত চুল্লী (খ) পরাবর্ত চুল্লী (গ) বৈদ্যুতিক চুল্লী

18. নিচের কোন্ ধাতুটিকে তড়িৎ-বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নিষ্কাশন করা হয় ?
(ক) তামা (খ) লোহা (গ) দস্তা (ঘ) সোডিয়াম।

সমাধান

1. বক্সাইট 2. ম্যাগনেসিয়াম 3. জিংক অক্সাইড 4. হিমাটাইট 5. জিংক 6. আয়রন 7. অ্যালুমিনিয়াম 8. সিলিভার 9. কাঁসা 10. রট আয়রন 11. জিংক 12. অ্যালুমিণিয়াম 13. ম্যাগনেসিয়াম 14 ডলোমাইট 15. Fe_3O_4 16. কপার 17. মারুত চুল্লী 18. সোডিয়াম।

কৃতী বিজ্ঞানী মেলভিন কেলভিন

বিবেক রায়

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত আলেক-জাণ্ডার উপত্যকায় শ্রীমতী কেলভিন-এর একটি সুন্দর বাগান ছিল। 'গফার' নামে ইঁদুর জাতীয় একপ্রকার প্রাণীর উৎপাতে বাগানটি এক সময় নষ্ট হবার উপক্রম হলো। ঐ প্রাণীরা দলবদ্ধভাবে বাগানে ঢুকে ভাল ভাল গাছের গোড়ার মাটি খুঁড়ে গাছগুলিকে মেরে ফেলতে লাগলো।

শ্রীমতী কেলভিন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী। ইঁদুর জাতীয় ঐ প্রাণীদের উৎপাত প্রতিরোধ করবার জন্যে শ্রীমতী কেলভিন এক অভিনব উপায় অবলম্বন করলেন। 'ইউফোরবিয়া ল্যাথিরিস' নামে এক জাতীয় বিষাক্ত আগাছা এনে তিনি বাগানের এখানে-ওখানে রোপন করলেন। ফল হলো অব্যর্থ। বাগানের গাছপালার ক্ষতিকর প্রাণীরা ঐ বিষাক্ত আগাছার ভয়ে বাগান ছেড়ে পালালো। রক্ষা পেল শ্রীমতী কেলভিনের সখের বাগান।

শ্রীমতী কেলভিনের স্বামী ডক্টর মেলভিন কেলভিন একজন খ্যাতনামা বায়োকেমিষ্ট। স্ত্রীর বাগানে লাগানো আগাছাগুলি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, ঐ আগাছার পাতা ছিঁড়লেই উদ্ভিদদেহ থেকে ক্রিম রঙের আঠালো একরকম রস বেরোয়। ঐ সময় দেশে গ্যাসোলিনের খুব অভাব। লোকে তাদের মোটর-গাড়ি নিয়ে কয়েক লিটার গ্যাসোলিন জ্বালানী পাওয়ার আশায় দোকানের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ডক্টর কেলভিনকেও অমনিভাবে অনেক সময় নষ্ট করতে হয়। বিজ্ঞানী কেলভিন চিন্তা করতে থাকেন—এই জ্বালানী সংকটের কোন সুরাহা করা যায় কিনা। কোনও উদ্ভিদ থেকে গ্যাসোলিন-এর বিকল্প তরল জ্বালানী পাওয়া যেতে পারে কিনা।

এমন সময় 'ইউফোরবিয়া ল্যাথিরিস' নামক উদ্ভিদ দেহজাত ঐ আঠালো রসের সন্ধান পেয়ে ডক্টর কেলভিন তা নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা শুরু করলেন। ঐ উদ্ভিজ্জ রস নিজের ল্যাবরেটরীতে নিয়ে গিয়ে ভালভাবে পরিশোধিত করে তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে গেলেন গ্যাসোলিনের বিকল্প এক তরল জ্বালানী। ডক্টর কেলভিন আরও পরীক্ষানিরীক্ষার পর বললেন যে, পৃথিবীর আধা-মরু অঞ্চলে যদি ঐ বিষাক্ত উদ্ভিদের আবাদ করা হয় তা হলে ঐ অঞ্চলের জমির সদ্ব্যবহার যেমন হবে, তেমনি বিশ্ব জুড়ে জ্বালানী তেলের যে সংকট চলছে তার আংশিক নিরসনও হবে। ডক্টর কেলভিন তাঁর গবেষণার ফলাফল বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিলেন। তারপর নিজেই পূর্ণোদ্যমে ঐ বিষাক্ত উদ্ভিদের চাষ শুরু করলেন।

ডঃ মেলভিন কেলভিন

1935 খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ ক'রে ডক্টর কেলভিন চলে যান ইংলণ্ডে। সেখানে মানচেষ্টার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রখ্যাত হাঙ্গেরীয় রসায়ন-বিজ্ঞানী মাইকেল পোলানির অধীনে গবেষণা শুরু করেন। পোলানি একদিন কেলভিনকে স্থানীয় একটি রাসায়নিক কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করতে বলেন। অনুসন্ধানের ফলে কেলভিন জানতে পারেন যে, ঐ দুর্ঘটনার মূলে ছিল ক্লোরোফিল গোত্রীয় একটি রঞ্জক পদার্থ। কেলভিন ঐ রঞ্জক পদার্থটি নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে সরাসরি ক্লোরো-ফিল নিয়েই গবেষণা শুরু করলেন।

সূর্যালোকের উপস্থিতিতে মাটি থেকে আহরণ-করা জল ও বায়ু থেকে আহরণ-করা কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের

সাহায্যে উদ্ভিদ তার খাদ্য প্রস্তুত করে এবং সেই প্রক্রিয়া ঘটার সময় অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়।

এই প্রক্রিয়ার নাম অঙ্গারআত্তীকরণ। নানান্ কারণে পরীক্ষাগারে এই প্রক্রিয়াটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশীলন করা খুবই কঠিন ব্যাপার। কিন্তু সেই কঠিন ব্যাপারটিই 1945 সালে সহজতর হয়ে উঠলো। সাইক্লোট্রোন যন্ত্রের আবিষ্কর্তা আর্নেস্ট লরেন্স 1945 খ্রীষ্টাব্দে একদিন ডক্টর কেলভিনের ল্যাবরেটরীতে এসে তাঁকে কার্বনের একটি আইসোটোপ C-14 উপহার দিলেন। কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাধ্যমে উদ্ভিদদেহে কার্বনের ঐ আইসোটোপটি প্রবেশ করিয়ে দিয়ে অঙ্গারআত্তীকরণের সময় উদ্ভিদদেহে যে জটিল রাসায়নিক ক্রিয়াগুলি সংঘটিত হয় তা ডক্টর কেলভিনের পক্ষে অনুধাবন করা সহজতর হলো। আর অঙ্গারআত্তীকরণ প্রক্রিয়াকে ভালভাবে অনুধাবন করার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যেই ডক্টর মেলভিন কেলভিন 1961 সালে রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পেলেন।

উদ্ভিদদেহ থেকে জ্বালানী তেল উৎপাদন ও অঙ্গার-আত্তীকরণ সম্পর্কিত গবেষণা ছাড়াও ডক্টর কেলভিন প্রাণের রাসায়নিক উৎস, স্মৃতিশক্তি, ক্যানসার রোগ ও পারমাণবিক শক্তি নিয়েও অনেক গবেষণা করেন। এক কথায় ডক্টর কেলভিনের প্রতিভা বহুমুখী। বয়স বর্তমানে একাত্তর বছর হলেও উদ্যমে ডক্টর কেলভিন এখনও তরুণ।

নোবেল পুরস্কার লাভের পর জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে ডক্টর মেলভিন কেলভিন বলেন: 'পুরস্কার লাভের আশায় আমি বৈজ্ঞানিক গবেষণা করি নি বা করিও না। আমি যা কিছু করেছি এবং এখনও করছি, তা কেবলমাত্র মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে।'

এখন কি করছেন ডক্টর কেলভিন? তিনি 'ইউফোরবিয়া ল্যাথিরিস' নামক উদ্ভিদটির এক উন্নত প্রজাতি সৃষ্টির জন্যে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। উদ্দেশ্য গবেষণা সফল হলে ঐ উদ্ভিদ থেকে আরও সস্তায় অনেক বেশি জ্বালানী তেল বা গ্যাসোলিনের বিকল্প তেল পাওয়া সম্ভব হবে। ডক্টর কেলভিনের দৃঢ় বিশ্বাস, এই বিষাক্ত আগাছাটি শুধু যে জ্বালানী তেলের সংকটমোচনে সহায়তা করবে তা নয়, এর থেকে ভবিষ্যতে একদিন প্লাষ্টিক জাতীয় পদার্থও উৎপাদন করা সম্ভব হবে। ডক্টর কেলভিনের ভাষায় 'ইউফোরবিয়া ল্যাথিরিস' এক অফুরন্ত সম্ভাবনাময় উদ্ভিদ।

এন বি/টি 55 খড়্গপুর, মেদিনীপুর।

পরলোকে ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রসায়ন বিজ্ঞানী অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গত 10 মে 91 বছর বয়সে কলকাতায় তাঁর বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

1893 সালে 23 এপ্রিল যশোর জেলার (অধুনা বাংলাদেশ) মহাদেবপুরে জ্ঞানেন্দ্রনাথের জন্ম। বর্ধমানের মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল থেকে 1909 সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে থেকে বি এস সি (1913) এবং এম এস সি (1915) পরীক্ষা কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করেন। এই সময় প্রেসিডেন্সি কলেজে একদল উজ্জ্বল ছাত্র ছিলেন, যাঁরা পরবর্তীকালে বিজ্ঞানজগতে বিশিষ্ট অবদানের জন্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি করেছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথের সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, প্রাণকৃষ্ণ পরিজা প্রমুখ।

1917 সালে স্যার আশুতোষ যখন বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, পুলিনবিহারী সরকার, নিখিলরঞ্জন সেন, শিশিরকুমার মিত্র প্রমুখের সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রনাথ স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যাপনার জন্যে আহূত হন। এরপর 1945 সালে তিনি নয়া দিল্লীতে ভারতীয় কৃষি গবেষণা ইনস্টিট্যুটের অধিকর্তা এবং 1950 সালে উত্তর প্রদেশের রুড়কীতে কেন্দ্রীয় আবাসন গবেষণা ইনস্টিট্যুটের অধিকর্তা নিযুক্ত হন। 1954-56 সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মধ্য শিক্ষা পর্ষদের প্রশাসক ছিলেন।

ভৌত রসায়ন গবেষণার ক্ষেত্রে, বিশেষত কোলয়েড রসায়ন, মৃত্তিকাবিজ্ঞান ও কৃষিবিজ্ঞান, জ্ঞানেন্দ্রনাথ অন্যতম পথিকৃৎ এবং এ বিষয়ে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দেশবিদেশে নানা বিজ্ঞান সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন এবং বহু সম্মাননাও পেয়েছিলেন। তিনি যেমন কৃতী বিজ্ঞানী ছিলেন, তেমনি একজন দক্ষ প্রশাসক এবং সংগঠকও ছিলেন। 1924 সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে যে ভারতীয় রসায়ন সমিতি গঠিত হয়, তিনি ছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এবং 1934 সালে মূলত তাঁরই উদ্যোগে ভারতীয় মৃত্তিকা বিজ্ঞান সমিতি স্থাপিত হয়। শেষ জীবনে তিনি আত্মচরিত রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন।

—শুভঙ্কর

জীবন বিজ্ঞানের বিচিত্র প্রশ্ন

উত্তর দিচ্ছেন তারকমোহন দাস

প্রশ্ন ঃ ফুল কেন গন্ধ ছড়ায় ?

শুভাশিস ঘোষ, কেশবপুর মহেন্দ্র ইনস্টিটিউশন, হুগলী।

উত্তর ঃ যে সব ফুল গন্ধ ছড়ায় তাদের পাপড়ি বা ফুলের অন্যান্য অংশে সুগন্ধী উদ্বায়ী রাসায়নিক পদার্থ তৈরী হয় এমন গ্ল্যাণ্ড আছে। এই উদ্বায়ী সুগন্ধী পদার্থ ব্যাপন-ক্রিয়ার সাহায্যে বাতাসে ছড়িয়ে যায়। তাই আমরা ফুলের গন্ধ পাই। যে সব ফুলের রং সাদা এবং প্রধানত রাত্রে ফোটে, যেমন রজনীগন্ধা, শিউলি, বেল, যুঁই তাদের গন্ধ খুবই প্রখর। তবে বহু রঙ্গীন ফুলেরও সুগন্ধ আছে, যেমন গোলাপ, চাঁপা, ইত্যাদি। ফুলের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে নানারকম পোকামাকড় প্রজাপতি, ভ্রমর, মৌমাছি আসে মধু সংগ্রহের জন্যে। মধু তৈরী হয় এমন গ্ল্যাণ্ডও ফুলে থাকে। এই সব পতঙ্গরা মধু সংগ্রহের সময় ফুলের পরাগ সংযোগে সাহায্য করে, যার জন্যে ফুল থেকে ফল হয়, বীজ হয়।

প্রশ্ন ঃ পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডলে যে অসংখ্য বালুকা কণা ভেসে বেড়ায়, তারা জীবাণু নামে পরিচিত। সেই জীবাণু একজন মানুষের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে দেহে প্রবেশের ফলে কি পরিমাণ ক্ষতি হতে পারে এবং কোন্ দিক থেকে তার প্রকটতা বেশি ?

রণজিৎ মজুমদার, এ, ভি, বি কলোনী, দুর্গাপুর।

উত্তর ঃ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যে অসংখ্য বালুকাকণা ভেসে বেড়ায় তারা জীবাণু নামে পরিচিত নয়, তারা সূক্ষ্ম-কণা বা 'পার্টিকুলেট ম্যাটার' নামেই পরিচিত, তাদের মধ্যে অবশ্যই কিছু জীবাণু থাকে।

কিন্তু তার সঙ্গে থাকে প্রচুর জৈব ও অজৈব পদার্থের কেলাস, কয়লার ঝুল-কালি, ফুলের রেণু, স্পোর, মৃত্তিকা কণা ইত্যাদি।

আমাদের বাতাসে যত দূষিত পদার্থ থাকে তার শতকরা 35-45 ভাগই হচ্ছে এই সূক্ষ্ম ধূলিকণা। অধিকাংশ কণিকাগুলির গায়েই কয়লার ঝুলকালি জড়িয়ে থাকে, স্বতন্ত্রভাবে সূক্ষ্ম কয়লার কণিকাও যথেষ্ট থাকে। এই কয়লার ঝুলকালির মধ্যে বেশ কিছু রাসায়নিক পদার্থ থাকে যা আমাদের দেহে ক্যানসার রোগ সৃষ্টি করতে পারে। যাঁরা ধূমপান করেন বা ধোঁয়ার মধ্যে কাজকর্ম করেন তাদের ক্যান্সার রোগ হবার সম্ভাবনা খুবই বেশি। ক্যানসার ছাড়াও বাতাসে ভাসমান এই সব সূক্ষ্ম কণিকা বেশি পরিমাণে আমাদের ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করলে নানারকম অ্যালার্জি, হাঁপানী, ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি আমাদের হতে পারে। ধোঁয়ার মধ্যে ভাসমান যে সূক্ষ্ম কয়লার কণিকা থাকে তা আমাদের ফুসফুসের সূক্ষ্ম প্রকোষ্ঠ-গুলির গায়ে কয়লার একটি কালো আস্তরণ সৃষ্টি করে। কয়লার এই আস্তরণটি সক্রিয়ভাবে বাতাস থেকে অন্যান্য দূষিত গ্যাস শোষণেও যথেষ্ট সাহায্যে করে। তাই শহরের ধোঁয়ার মধ্যে যাঁরা বাস করেন এবং ধূমপান করেন তাঁদের ফুসফুসের নানারকম মারাত্মক রোগ হবার সম্ভাবনা খুব বেশি। গ্রামের মধ্যে কলকারখানা ও যানবাহনের দূষণশূন্য পরিবেশে যাঁরা বাস করেন এবং ধূমপান করেন নি, তাঁদের ঐ সব রোগ হবার সম্ভাবনা খুব কম।

প্রশ্ন ঃ বিজ্ঞানী ভাইসম্যান ল্যামার্কের সূত্রের সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে অনেকে দেখেন যে, জন্ম পর্যন্ত ইঁদুরের ল্যাজ কেটে দিলেও পুনরায় ল্যাজওয়ালা ইঁদুরই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু আমি মনে করি এখানে ইঁদুর নামক প্রাণীটির ল্যাজের প্রয়োজন রয়েছে, তাই পুনরায় ল্যাজওয়ালা ইঁদুর জন্মগ্রহণ করেছে। যদি এই পরীক্ষাটি কোনও প্রাণীর লুপ্তপ্রায় অঙ্গ বা কোনো অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ কেটে করা যায় তবে ঐ নবজাতক প্রাণীটির ঐ অঙ্গটি আর হবে না।

তাপসকুমার সাহানা, ভদ্রেশ্বর, হুগলী।

উত্তর ঃ প্রশ্নটির মধ্যে যথেষ্ট মৌলিকতা আছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এইভাবেই প্রয়োগ করতে হয়। তবে লুপ্তপ্রায় অঙ্গ কাটলেও ইঁদুরের কোন কোষ বা দেহের অন্যান্য কোষের অন্তর্গত নিজের কোনো পরিবর্তন হবে না। সুতরাং ইঁদুরের বংশগত বৈশিষ্ট্যের কোনো পরিবর্তন ঘটবার সম্ভাবনা নেই

প্রশ্ন ঃ মাঝে মাঝে টিকটিকির লেজ খসে পড়ে কেন ?

শান্তনু, শেখর ও প্রশান্ত পট্টনায়ক, পুরুলিয়া।

উত্তর ঃ টিকটিকি এক অতি বিচিত্র সরীসৃপ। লেজের

মধ্যে তারা প্রধানত চর্বি ও আমিষ জাতীয় খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে এবং প্রয়োজনের সময় তা ব্যবহার করে থাকে। আমাদের দেহেও সঞ্চিত চর্বি আমরা ব্যবহার করে থাকি। মানুষ খেতে না পেলে রোগা হয়ে যায়, তারও অন্যতম কারণ এই। টিকটিকির লেজ এক বিশেষ পদ্ধতিতে আলগাভাবে দেহের সঙ্গে জোড়া থাকে এবং সামান্য বল-প্রয়োগেই তা একটি নির্দিষ্ট অংশ থেকে খুলে আসে।

টিকটিকির তাতে কোন ক্ষতি হয় না, তার আবার নতুন লেজ জন্মায়। কাটা লেজটি সামান্য কিছুক্ষণ মাটির ওপর ধড়ফড় করে লাফাতে থাকে, তারপর স্থির হয়ে যায়। অনেকে বলেন, শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার এটি তাদের একটি উপায়। কাটা লেজটির ওপর শত্রুর মনোযোগ যখন আকৃষ্ট হয়, সেই ফাঁকে টিকটিকি পালিয়ে যায়। পরিবেশের মধ্যে খাদ্যের যখন প্রচণ্ড অনটন দেখা দেয় তখন বড় টিকটিকি অনেক সময় অপেক্ষাকৃত ছোট টিকটিকির লেজ কেটে খেয়ে নেয়।

প্রশ্ন ঃ অনেক শিকারের গল্পে শুনেছি রাতের বেলায় বাঘ, সিংহের চোখ জ্বলছে দেখা যায়। সত্যিই কি এর কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে ?

প্রদীপ দাস, দমদম।

উত্তর ঃ রাতের অন্ধকারে সত্যই বাঘ, সিংহের চোখ জ্বল-জ্বল করে। শুধু বাঘ, সিংহ নয়, বিড়ালেরও করে। বাঘ সিংহ প্রভৃতি সকল বিড়াল জাতীয় প্রাণীই অন্ধকারে আমাদের থেকে ভালো দেখতে পায়। ওদের চোখের কোরয়েড অংশে **'ট্যাপেটাম ল্যাসিডাম'** নামে একটি বিশেষ স্তর থাকার জন্যে জ্বল জ্বল করে ওদের চোখ। এই ট্যাপেটাম ল্যাসিডাম অসংখ্য সূক্ষ্ম রূপালি কৃস্টাল প্লেটের সাহায্যে তৈরী, এটি আলোকের প্রতিফলনে সাহায্য করে।

প্রশ্ন ঃ মুরগীর খাদ্যে শতকরা কতভাগ আমিষ জাতীয় পদার্থ থাকা আবশ্যক ?

সৌমিত্র মজুমদার, পূর্বাচল পল্লী, রহড়া।

750 মিলিগ্রামে থেকে 1·3 গ্রাম আমিষ জাতীয় পদার্থ প্রতিদিন প্রতি কেজি ওজনের মুরগীর আবশ্যক হয়।

সমীর দালাল, বাহাদুরপুর, বর্ধমান। দিলীপকুমার ঘোষ, কোতুলপুর হাইস্কুল, বাঁকুড়া। স্মৃতিকণা কর, গোবরডাঙ্গা, ভট্টাচার্যপাড়া ২৪ পরগনা। যে প্রশ্নগুলি তোমরা করেছ তার উত্তর এবং অধিকাংশেরই ছবি সমেত ব্যাখ্যা তোমাদের জীববিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকেই আছে। এ সম্পর্কে আরো বেশি কিছু জানতে হলে উচ্চ-মাধ্যমিকের জীববিজ্ঞানের যে কোন পাঠ্যপুস্তক দেখতে পার।

35 বালিগঞ্জ সারকুলার রোড, কলি-19

হাসতে হাসতে ব্যথা সারে

বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী

হাসতে হাসতে যে অসুখও সারতে পারে আজ সেই কথাটাই তোমাদের কাছে বলি।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ষ্ট্যামফোর্ড মেডিক্যাল কলেজের মনোবিজ্ঞান বিভাগের বিশেষজ্ঞ ডাঃ উইলিয়াম ফ্রাই গবেষণা করে বলেছেন ঃ হাসি, বিশেষ করে উচ্চহাসি শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলিকে এমন নাড়া দেয় যে তার ফলে শরীর সব দিক দিয়ে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। উচ্চহাসিতে ডায়াফ্রাম বুক ফুসফুস-হৃদপিণ্ড যকৃৎ সব কিছুরই ব্যায়াম হয়। হাসির চোটে শ্বাসনালীর মধ্যে যে ধূলোময়লা শ্লেষার সঙ্গে মিশে থাকে তা পরিষ্কার হয়ে যায়। মুখ হাত গলার পেশীগুলোরও ব্যায়াম হয়।

মনের দিক থেকে উদ্বেগ ভয় অপরাধবোধ একঘেঁয়েমি ভাব অবসাদ কাটাতে সাহায্য করে, এমন কি মাথাধরা আর পিঠব্যথাও সারাতে পারে। ডাঃ ফ্রাই গবেষণা করে বলেছেন যে, হাসিতে গ্রন্থি থেকে একরকম রস নিঃসরণ হয়, যার নাম দিয়েছেন এনডরফিন। এই রসকে দেহের ভিতরকার আফিম বলা যায়। এর এমন একটা ক্রিয়া আছে যে বেদনা উদ্বেগ এতে নষ্ট হয়।

সেজন্যে ডাঃ ফ্রাই বলেন রোগ সারাতেও হাসির একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। যে ঘটনাতে ডাঃ ফ্রাই-এর নজর এদিকে আসে তা কিন্তু বেশ মজার ব্যাপার। একজন খুব ধনী লোকের দুরারোগ্য স্পণ্ডিলাইটিস হয়। ডাক্তারেরা বললেন, সারবার কোনও আশা নেই। তাঁকে যন্ত্রণার চোটে রাত্রে ওষুধ খেতে হয় অল্প একটু ঘুম আনবার জন্যে। দিবারাত্রি যন্ত্রণা। ডাক্তারেরা যখন জবাব দিলেন তখন ভদ্রলোক করলেন কি—ভাবলেন যখন ভাল হবই না টাকার সদব্যবহার করি। দেখি ত হাসিখুশী থাকা যায় কিনা।

ভদ্রলোক একটা বড় হোটেলে ঘর ভাড়া নিলেন। সেই হোটেলে রোজ নানারকমের সিনেমা দেখানো হত। ভদ্রলোক ম্যানেজারকে অনেক টাকা দিয়ে অনুরোধ করলেন যাতে তাঁরা রোজ হাসির ছবি আনেন। আর নিজের ম্যানেজারকে বললেন ভাল ভাল হাসির বই তাঁকে কিনে দিতে। তাঁর কাজই হল, দিনে হাসির বই পড়া আর রাত্রে হাসির ছবি দেখে লুটিয়ে পড়া। এইভাবেই তাঁর স্পণ্ডেলাইটিস রোগ ভাল হয়।

রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর।

উদ্ভিদের জীবনে আলো

সাধনানন্দ মণ্ডল

বিকেলের দিকে গাছপালাকে লক্ষ্য করলে একটা জিনিস চোখে পড়ে। সারাদিনের রৌদ্র পরিতৃপ্ত ঘাসের ডগাগুলিকে মনে হয় এলিয়ে পড়েছে পৃথিবীর কোলে। অনেক গাছের পাতারই মাথা নুয়ে পড়ে। কোন কোন গাছের যৌগিক পত্রগুলি মুড়ে যায়, যেন ঘুমোতে চায় গাছের ডালে। দিনের আলো আর তাপ যত কমে আসে ততই বেশ কিছু ফুলের পাপড়ি মুড়ে যায়। আবার তেমনি কিছু কিছু ফুল সারাদিন পাপড়ি মুড়ে থাকার পর সেগুলিকে খোলার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, আলো এবং তাপ বাড়াকমার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে সাড়া দিচ্ছে। এই সাড়া দেওয়া জীবনের একটি বৈশিষ্ট্য—এটি তার বেঁচে থাকার একটি লক্ষণ। যেহেতু উদ্ভিদ একটি জীব, সেহেতু সেও একাজে সামিল হতে বাধ্য! তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে। প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয়েই যদিও সজীব, যদিও একই পৃথিবীর বাসিন্দা এবং একই প্রাকৃতিক শক্তি এবং পরি-বেশের অধীন, তবুও তাদের সাড়া দেওয়ার ধরন অনেক ক্ষেত্রেই আলাদা—এক্ষেত্রে তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অবশ্য তার যথেষ্ট কারণও আছে। উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যে বেশ কিছু মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করার মতো। বেশির ভাগ প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্র রয়েছে, কোন উদ্ভিদের যা নেই। আর তাই অবধারিতরূপে তাদের 'আচরণের' মধ্যে পার্থক্য চোখে পড়ে। তা ছাড়া প্রাণী ও উদ্ভিদের বেঁচে থাকার ধরনের মধ্যেও বেশ কিছু মৌলিক তফাৎ রয়েছে। সেজন্যে বাঁচার লক্ষণ হিসেবে বাহ্য উদ্দীপনায় সাড়া দেবার ধরনটাও দুজনের ক্ষেত্রে আলাদা। আঘাত পেলে বা পুড়ে গেলে একটি প্রাণীর যা আচারণ বা প্রতি-ক্রিয়া আমরা দেখি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তেমন আমরা দেখি না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে উদ্ভিদের যেন কোন অনুভূতি নেই। কারণ আমরা তো তার কোন বহিঃ-প্রকাশ আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বুঝতে পারি না। কিন্তু সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিজ্ঞানীরা আমাদের ভুল ভেঙ্গে দিয়েছেন। আজ আমরা বুঝেছি উদ্ভিদও কষ্ট পায়, যন্ত্রণা অনুভব করে, তবে সেটা উদ্ভিদের মতো তার নিজস্ব পদ্ধতিতে!

অধিকাংশ উদ্ভিদ একই জায়গায় মাটির সঙ্গে আবদ্ধ থাকে এবং জীবন-ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ এ অবস্থাতেই সংগ্রহ করতে পারে বলেই তাদের জীবনে অন্যত্র যাবার কোন প্রয়োজন হয় নি। সেজন্যই উদ্ভিদরা নিশ্চল। তবে সবাই নয়, নিম্ন শ্রেণীর এককোষী উদ্ভিদরা এর ব্যতিক্রম। উচ্চতর উদ্ভিদরা প্রাণীদের মতো সামগ্রিক-ভাবে চলাফেরা করতে না পারলেও বাহ্য উদ্দীপনায় সাড়া দিতে গিয়ে তাদের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সঞ্চালিত করে। বিভিন্ন ধরনের উদ্দীপক দ্বারা উদ্ভিদরা অবশ্যই প্রভাবিত হয় এবং সেটা তাদের বাঁচার তাগিদেই।

আলো ছাড়া উদ্ভিদের, বিশেষত সবুজ উদ্ভিদের জীবন-ধারণ সম্ভব নয়। তাই তার জীবনে আলোর প্রভাব অত্যধিক। কিছু কিছু পতঙ্গ যেমন আলোর চারপাশে ভিড় করে তেমনি শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদরাও আলোর দিকে চলে যায়। অধিকাংশ উদ্ভিদ আটকে রয়েছে মাটির সঙ্গে, কাজেই শৈবালের মতো আলোর পেছনে ছোটার উপায় তাদের নেই। কিন্তু আলো তো চাই! তাই দেখা যায় উদ্ভিদের কাণ্ড এবং শাখাপ্রশাখা আলোর দিকেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদ্ভিদের শেকড়ের কিন্তু এমন আলোক-প্রীতি নেই, সে অন্ধকারের বাসিন্দা। তাই তার বৃদ্ধি আলোক উৎসের বিপরীত দিকেই হয়। উদ্ভিদের কাণ্ড এবং শাখা-প্রশাখার এইরকম আলোকপ্রীতির যথেষ্ট কারণ রয়েছে। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই উদ্ভিদের খাদ্য প্রস্তুত হয়; আলো ছাড়া সে প্রক্রিয়া অচল। কাজেই এ প্রক্রিয়া বন্ধের অর্থই হলো উদ্ভিদের উপবাস। সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ যেমন ক্লোরোফিল, ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিল, ফাইটোবিলিন প্রভৃতির গুরুত্ব অসীম। এগুলিও আলো ছাড়া উদ্ভিদের দেহে তৈরী হয় না। আলো ছাড়া গাছে কুঁড়ি আসবে না, পাপড়িতে রং ধরবে না; আলো ছাড়া ফুলের বাহারী রং কীটপতঙ্গ কিংবা পাখীর চোখে ধরাও পড়বে না। আর এদের বাদ দিয়ে অনেক গাছের পরাগ সংযোগ আদৌ সম্ভব নয়। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া এবং কুঁড়ি জন্মানো এই 'কাজ দুটি হচ্ছে উদ্ভিদের পাতা এবং শাখাপ্রশাখায়; এগুলি আবার কাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত। সুতরাং উদ্ভিদের কাণ্ডকে আলোর সন্ধানে তৎপর হতেই হয়। এছাড়া তার গত্যন্তর নেই। এ তো গেল পরিণত উদ্ভিদের কথা। এমনও জানা গেছে, কোন কোন উদ্ভিদের অঙ্কুরোদগমও আলো ছাড়া হয় না! কাজেই উদ্ভিদকে আজীবনই 'আলো আমার আলো' গাইতে হয়! পৃথিবীতে সূর্যই আলোর প্রধান উৎস। সূর্যের আলোতে সাতটি রং-এর আলো রয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন

উঠতে পারে উদ্ভিদ কি এই সব কটি আলো পেতে সমান আগ্রহী? বিজ্ঞানীরা বলছেন, না তা নয়—লাল এবং নীল্চে বেগুনী আলোর জন্যেই উদ্ভিদরা বেশি কাঙাল।

আলোক-উৎসের দিকপথ যেমন উদ্ভিদজীবনকে প্রভাবিত করে ঠিক তেমনি আলোর তীব্রতার তারতম্যও তার জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যমুখী, পদ্ম প্রভৃতি ফুল পাপড়ি মেলতে থাকে। বেলা যত বাড়ে সূর্যালোকের তীব্রতাও তত বাড়ে আর এই সব ফুল তত বেশি করে পাপড়ি খোলে। বেলা গড়িয়ে যত বিকেল হয়ে আসে রোদের তেজও তত কমে যায় অর্থাৎ আলোর তীব্রতা কমতে থাকে; এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই সব ফুলও পাপড়ি মোড়া শুরু করে দেয়। এই সব ফুল এত বেশি আলোক সচেতন যে মেঘলা দিন ভরদুপুরেও মুখ লুকিয়ে বসে থাকে—ফুটতে চায় না। সূর্যগ্রহণের সময় সূর্য যত বেশি করে ঢাকা পড়ে আলোর তীব্রতাও তত কমে যায়। তখনও দেখা গেছে এরা আলোর ওপর অভিমান করে পাপড়ি মুড়ে দিয়েছে। বেল, হাস্নাহানা, সন্ধ্যামালতী প্রভৃতি ফুল একেবারেই দিনের আলো পছন্দ করে না। তাই সারাদিন এরা মুখ লুকিয়ে বসে থাকে—সূর্যের সঙ্গে এদের এমনই বিবাদ যে এরা যেন তার মুখ দেখতে নারাজ। সূর্য যেই ডুবে যায়, চারদিকে যেই ছড়িয়ে পড়ে অন্ধকার, অমনি এদের মুখে হাসি ফোটে—পাপড়ি মেলে নিজেদের রূপলাবণ্য দেখানোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শুধু যে ফুলরাই এমন আলোকসচেতন তা নয়; কিছু কিছু গাছের পাতাও এমন 'আচরণ' করে। এই যেমন তেঁতুল, বাবলা, আমরুল, শিরীষ, আমলকী প্রভৃতি গাছের পাতা। সারাদিন এগুলি খোলা থাকে; কিন্তু সূর্য ডুবলেই, দিনের আলো নিভে এলেই একে একে মুড়ে যায়—শত চেষ্টা করেও এদেরকে তখন আর খুলে রাখা যায় না। হাত জোড় করে আমরা যেমন নমস্কার করি এরাও যেন দিনের শেষে সূর্যদেবকে পাতা মুড়ে সেদিনের মতো বিদায়ী নমস্কার জানায়।

আলোর প্রভাবে উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গের এই যে সঞ্চালন এর কারণ কিন্তু সবক্ষেত্রে একইরকম নয়। যেমন উদ্ভিদের কাণ্ড এবং শাখাপ্রশাখার আলোক অভিমুখী যাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে হরমোন বা উৎসেচক। পাতা বা পাপড়ির বন্ধ হয়ে যাওয়া বা খুলে যাওয়া নিয়ন্ত্রিত হয় অন্য পদ্ধতির মাধ্যমে। পত্ররন্ধ্রের (পাপড়িতেও পত্ররন্ধ্র থাকে; কারণ পাপড়ি মূলত গাছের পাতা) প্রহরী-কোষ আলোকের তীব্রতর হ্রাসবৃদ্ধির জন্যে সংকুচিত ও প্রসারিত হয় এবং এর জন্যেই গাছের পাতা মুড়ে যায় কিংবা খোলা থাকে।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় আলোর সঙ্গে তাপের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আলো এবং তাপ একই সঙ্গে উদ্ভূত হচ্ছে—একটার থেকে অন্যটাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যেমন এই সূর্যের আলো; আলোর সঙ্গে সঙ্গে তাপও পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই উদ্ভিদ আলোর দ্বারা প্রভাবিত হতে গিয়ে তাপের প্রভাবকেও অস্বীকার করতে পারে না। সেজন্যে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপও যখন বাড়ে সেই তাপও উদ্দীপকের মতো কাজ করে। পদ্ম, টিউলিপ প্রভৃতি ফুল তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাপড়ি মেলে আবার বিকেলের দিকে আলো কমার সঙ্গে সঙ্গে তাপও যখন কমে আসে পাপড়িগুলি একে একে বন্ধ হয়ে যায়। শিম জাতীয় উদ্ভিদের পাতা আবার বেশি তাপে খোলা থাকে না। তাই দেখা যায় ভরদুপুরের কড়া রোদে পাতাগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। মনে হবে গাছটা যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। তামাক, ফণীমনসা, নাগফণা প্রভৃতি গাছের ফুল আলো এবং তাপ দুই-ই খুব পছন্দ করে। আলো আর তাপ যত বাড়ে ততই এদের স্ফূর্তি হয়—ধুম পড়ে যায় ফুল ফোটানোর। রাত হলেই আলো নেই, তাপমাত্রাও কম; অতএব ধুমধামও শেষ—পাপড়ি গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকা আগামী দিনের আলো এবং উত্তাপের আশায়।

কাঁথি, মেদিনীপুর

অনিবার্য কারণে এই সংখ্যায় **'অচেনা আকাশ'** সিরিজের লেখাটি প্রকাশ করতে না পারায় আমরা দুঃখিত। —সম্পাদক

ধারাবাহিক কল্পবিজ্ঞান কাহিনী

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সবুজ বনের গান

[দুই] উদ্ভিদের গোপন কথা

আমার বৃদ্ধ বন্ধুকে ইদানিং ক্যাকটাস এবং অর্কিড-জাতীয় উদ্ভিদ নিয়ে কী সব বিদঘুটে ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে দেখতাম। একদিন গিয়ে দেখি, হেড-ফোন মাথায় এঁটে বসে আছেন এবং একটা অ্যামপ্লিফায়ার যন্ত্রের নব ঘোরাচ্ছেন। একটা অদ্ভুত আকৃতির নধর ক্যাকটাসের গায়ে পিন ফুটিয়ে রেখেছেন। পিনের মাথায় সূক্ষ্ম তামার তার বাঁধা। তারটা আরও একটা ক্ষুদে যন্ত্রের ভেতর দিয়ে এসে অ্যামপ্লিফায়ারে পৌঁছেছে। ক্ষুদে যন্ত্রটা জারে তরলপদার্থের ওপর ভাসছে। তারপর অবাক হয়ে দেখি, উনি চোখ বুজে থিরথির করে কাঁপতে লাগলেন। অমনি ভাবলাম, এই রে! বুড়ো নির্ঘাৎ তড়িতাহত হয়ে পড়েছেন।

যেই না মনে হওয়া, দৌড়ে গিয়ে মেন সুইচ অফ করে দিলাম। হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরে এসে রুদ্ধশ্বাসে বললাম, 'কর্নেল! কর্নেল! আপনি সুস্থ তো?'

কর্ণেল নীলাদ্রি সরকার গর্জন করে উঠলেন, 'শাট আপ ইউ ফুল!'

কস্মিনকালে ওঁর কাছে এমন ধমক খাই নি। আমি তো থ! একটু পরে অভিমান দেখিয়ে বললাম, 'বাঃ! এই আপনার কৃতজ্ঞতাবোধের নমুনা! ইলেকট্রিক শক খেয়ে থিরথির করে কাঁপছিলেন। এতক্ষণ অক্কা পেয়ে যেতেন। বাঁচিয়ে দেওয়াটা বুঝি অন্যায় হল? ঠিক আছে এবার খাবি খেতে দেখলেও মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব—তবে না আমার নাম জয়ন্ত!'

কর্নেল তখন ফিক করে হেসে ফেললেন। 'উত্তেজিত হয়ো না ডার্লিং! তোমার কোনো দোষ নেই। ষষ্ঠিচরণ! ও ষষ্ঠী!' ভৃত্য ষষ্ঠিচরণ পর্দা তুলে মুখ বের করলে বললেন, 'মেন সুইচটা অন করে দাও। আর শোনো, ঝটপট আমার তরুণ বন্ধুর জন্যে কড়া করে কফি বানাও। আমিও খাব।'

শান্ত হয়ে বসলে বললেন, 'জয়ন্ত! ওই মেক্সিকান ক্যাকটাসের সঙ্গে আমি একটু বাতচিত করছিলাম।'

অবাক হয়ে বললাম, 'বলেন কী!'

'হ্যাঁ ডার্লিং! আচার্য জগদীশ বোসের যুগান্তকারী আবিষ্কারের পর অনেকগুলো দশক কেটে গেল। এখন বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন, উদ্ভিদের শুধু সুখদুঃখের অনুভূতি নয়, সাড়া দেবারও শক্তি আছে। সেই সাড়া দেওয়াটাকেই বলব উদ্ভিদের ভাষা। ভাষাটা কিন্তু শব্দ দিয়ে নয়, কম্পন দিয়ে তৈরি। বিভিন্ন স্তরের সূক্ষ্ম-অতিসূক্ষ্ম কম্পনে তার কথা প্রকাশ পায়। এই ক্যাকটাসটা সবে কথা বলতে শুরু করেছিল এবং আমিও তার ভাষায় জবাব দিচ্ছিলাম—হঠাৎ তুমি এসে সবটাই ভেস্তে দিলে!'

হাসতে হাসতে বললাম, 'আপনাকে হিস্টিরিয়া রোগীর মতো কাঁপতে দেখছিলাম। কী আশ্চর্য! ওভাবেই বুঝি গাছপালার সঙ্গে কথা বলতে হয়?'

কর্নেল জারে ভাসমান ক্ষুদে যন্ত্রটা দেখিয়ে বললেন, 'এটা একটা গ্যালভ্যানোমিটার। তুমি লাই-ডিটেকটর যন্ত্রের কথা জানো—যা অপরাধী সত্য বলছে, না মিথ্যে বলছে, ধরিয়ে দিতে পারে। এটা তারই একটা অংশ। এর ভেতর একটুকরো গ্র্যাফ-পেপার আছে এবং একটা সূক্ষ্ম পেন্সিলের শিস আছে। গত শতকের শেষভাগে ভিয়েনার এক ধর্মযাজক ফাদার ম্যাক্সিমিলিয়ান হেল এর উদ্ভাবক। পরে ইতালীয় বিজ্ঞানী লুইজি গ্যালভানি প্রাণীজ বিদ্যুৎ আবিষ্কার করে যন্ত্রটা আরও উন্নত করেন। তাঁর নামে যন্ত্রটার নাম দেওয়া হয় গ্যালভানোমিটার। আরও পরে ইংরেজ বিজ্ঞানী স্যার চার্লস হুইটস্টোনের আবিষ্কৃত বিদ্যুৎ সার্কিট হুইটস্টোন ব্রিজ পদ্ধতি কাজে লাগানো হয়েছে। তবে...'

বাধা দিয়ে বললাম, 'কিচ্ছু বুঝব না। আমি বিজ্ঞানের

ছাত্র ছিলাম না।'

'তা হলে গাছের পাতা নিয়ে ব্যাকস্টার নামে এক বিজ্ঞানীর পরীক্ষার কথা শোনো। তিনি অসংখ্য পরীক্ষার পর বলেছিলেন, উদ্ভিদেরা চক্ষু ছাড়াই দেখতে পায়—মানুষ যতটা দেখতে পায়, তারও বেশি। উদ্ভিদের যেন মন আছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, সে এই বিশাল প্রাণীজগতের অন্যতম শরিক এবং সে সব প্রাণীর মনের কথা টের পায়।'

'সেই ব্যাকস্টার সায়েব বলেছেন এ কথা?' আমি হাঁদারামের মতো তাকিয়ে বললাম। 'সর্বনাশ! যখন আপনার বাসায় আসি, ওইসব বিদঘুটে গড়নের উদ্ভিদগুলোকে দেখে মনে মনে কত হাসি—এমন কী, একদিন আপনার পরীক্ষিত ওই অষ্টাবক্র ক্ষুদে উদ্ভিদটিকে দেখিয়ে যেদিন ষষ্ঠিচরণকে বলছিলাম, ব্যাটা যেন সার্কাসের ক্লাউন! ওরে বাবা! তা হলে তো ও বেজায় রাগ করছিল আমার ওপর!'

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, 'এই যে এখন তুমি এসেছ এবং তার কথাবার্তায় বাধা দিয়েছ, এতে ও কি ক্রুদ্ধ না হয়ে পারে?'

'কাছে গেলে প্যাঁক করে কাঁটা ফুটিয়ে দেবে বুঝি?'

'তা হয়তো দেবে না। কিন্তু তুমি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রোড থেকে বিকিরণ বেড়ে গিয়েছিল এবং গ্যালভানোমিটার কাঁপছিল। একমিনিট। গ্র্যাফটা বের করি।'

কর্নেল ক্ষুদে যন্ত্র থেকে একটুকরো কাগজ বের করে দেখালেন। অসংখ্য আঁকাবাঁকা রেখা জটিল হয়ে আছে দেখলাম। বললাম, 'এই বুঝি ওর রাগের ভাষা?'

কর্নেল আমার তামাসায় কান না দিয়ে বললেন, 'এই কাগজটার নাম পলিগ্রাফ। বিখ্যাত ব্যাকস্টার এক্সপেরিমেন্টের সূত্র ধরে আমি এই জটিল রেখাগুলোকে বিশ্লেষণ করতে পারি। এগুলো আসলে কোড ল্যাঙ্গোয়েজ অর্থাৎ সাংকেতিক ভাষা। কোডগুলোকে শ্রেণীবদ্ধ করে অর্থোদ্ধার করা সম্ভব। যাই হোক, আপাতত কফি খাও। তারপর দুই বিজ্ঞানী স্যাক্স রোমার এবং বুলওয়ার লিটনের পরীক্ষার গল্প বলব। সে আরও বিচিত্র ঘটনা। তাঁরা আমেরিকার নিউ জারসিতে একটা কারখানার কাছে খুন হওয়া একটি মেয়ের খুনীকে ধরিয়ে দিতে পেরেছিলেন!'

'আপনার মতো তাঁরা সখের গোয়েন্দাও ছিলেন বুঝি?'

'না, জয়ন্ত। ওঁরা নিছক বিজ্ঞানী। পদার্থ এবং জীববিদ্যার চর্চা করতেন। যেখানে মেয়েটি খুন হয়েছিল সেখানে ছিল একটা বুনো আপেল গাছ। গাছটাই ধরিয়ে দিয়েছিল খুনীকে।'

'চেঁচিয়ে বলেছিল—পাকড়ো! পাকড়ো!'

'তামাসা নয়' ডার্লিং! এটা বাস্তব ঘটনা। একটুকরো পলিগ্রাফ আর একটা গ্যালভানোমিটার, একটা ইলেকট্রোড—ব্যাস! এ তিনটি জিনিস গাছটার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে লোক জড়ো করা হয়েছিল গাছটার সামনে। একবার করে পাতা ছুঁয়ে যেতে বলা হয়েছিল প্রত্যেককে। তারপর দেখা গেল, একজনের ছোঁয়ার পর পলিগ্রাফে গাছটা তীব্রভাবে সাড়া দিয়েছে। কম্পনরেখা বিশ্লেষণ করে বোঝা গেল, সেই লোকটাই খুনী।'

সেদিন কর্নেল সারাবেলা এইসব উদ্ভুট্টে কথাবার্তা বলেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, 'জয়ন্ত, তুমি ই এস পি কথাটা কি শুনেছ?'

'শুনেছি। এক্সট্রা সেনসরি পার্সেপসন। অর্থাৎ অতিরিন্দ্রিয় অনুভূতি।'

'উদ্ভিদের মধ্যে ই এস পি অধুনা সুপ্রমাণিত। তারা এমন জিনিস দেখতে পায় এবং বুঝতে বা জানতে পারে—যা আমরা দেখতে পাই না ও জানি না। ডার্লিং! আচার্য জগদীশ বসু যেখানে শুরু করেছিলেন, সেখান থেকে একালের সব উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীর হাতেখড়ি। তোমার এত বেশি অবাক হবার কারণ নেই। তামাসা করাও শোভা পায় না। আচার্য জগদীশচন্দ্র এই কলকাতারই মানুষ ছিলেন। তুমি কি তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা শোনো নি?'

এই সব শোনার পর থেকে কর্নেলের বাসায় যখনই গেছি, ওঁর লালিত-পালিত উদ্ভিদ মশাইদের প্রতি সসম্ভ্রমে দৃষ্টিপাত করেছি। এমন কি একটা ক্যাকটাসকেও বলেছি, 'হ্যাল্লো লিটলবয়! হাউ ড্যু ড্যু!'

কর্নেলের সঙ্গে গল্প করতে করতে হঠাৎ চোখ গেছে ড্রয়িং রুমের কোণায় রাখা কয়েকটা টবের গাছের দিকে। অমনি বুকটা ধড়াস করে উঠেছে, যেন ক্যাটক্যাট করে তাকিয়ে আমাকে দেখছে—মনের ভেতর কী যেন পেঁচানো মতলব পোষা!

স্বীকার করছি, গাছপালা অর্থাৎ উদ্ভিদ সম্পর্কে বুড়ো ভদ্রলোকটি আমার দৃষ্টিভঙ্গি আমূল বদলে দিয়েছিলেন যেন। রাস্তায় যেতে যেতে গাড়ি থামিয়ে কোনো বিশাল গাছের দিকে তাকিয়ে থেকেছি অবাক চোখে। তারপর মনে মনে বলেছি, 'হ্যাল্লো জেন্টলম্যান! ভাল আছেন তো?' যেন মনে হত, বৃক্ষভদ্রলোক একটু করুণ হেসে বলছেন, 'খুব ভাল নয় মশাই! সি এম ডি এর

হালচাল দেখে বড় তটস্থ আছি। কিছু বলা যায় না।'

ঠিক এমনি করে চৌরঙ্গীতে টাটা বিল্ডিংয়ের সামনে একটা সুন্দর নাদুসনুদুস গড়নের বৃক্ষভদ্রলোক আমাকে ফিসফিসিয়ে বলেছিলেন, 'দিনকাল ভাল না। আজ আছি, কাল নেই অবস্থা।'

'সে কী! কেন বলুন তো?'

'ওরা আসছে। পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। হাতে হাতে কুড়ুল। পেছনে পেল্লায় আর্থ এক্সক্যাভেটার গাড়ি!'

'কারা? কারা?'

'আবার কারা? পাতাল রেলের লোকেরা। আপনাদের মানুষ জাতটার ঠেলায় আমরা মশাই চিরকাল অস্থির। কোণঠাসা করতে করতে আমাদের শেষ করে ফেললেন প্রায়। বুঝবেন শেষে ঠ্যালাটা—যখন দেশটা মরুভূমি হয়ে যাবে।'

সেই রবিবার কর্নেলের ঘরে জর্জ ব্যুগেনভিলির সঙ্গে পরিচয় হবার পর এই সব কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। কোকোস দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত কিওটা দ্বীপের উদ্ভিদরহস্য আমাকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছিল। 'কোথাও রঙ্গোরঙ্গো'—কথাবলা বন তা হলে সত্যি আছে পৃথিবীতে?

তা হলে সেখানে যেতে একদিন বাধা কী ছিল বিজ্ঞানীদের? দ্বীপটা যখন সবাই চেনে তখন যায় নি কেন কেউ? আমার এসব প্রশ্ন শুনে ব্যুগেনভিলি বলেছিলেন 'সমস্যা হল দ্বীপটা ঠিক কোথায় কেউ জানে না। কোকোস দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত দ্বীপ বলা হয় বটে, কিন্তু যতবারই ওখানে অভিযাত্রীদল গেছে, দুই দ্বীপপুঞ্জে তেমন কোনো অদ্ভুত দ্বীপ দেখতে পায় নি।

'কিন্তু আপনি গিয়েছিলেন!'

'হ্যাঁ। কিন্তু সে তো ভাসতে-ভাসতে দৈবাৎ গিয়ে পড়েছিলাম। উদ্ধার পাওয়ার পর জাহাজ নিয়ে গিয়ে তন্নতন্ন খুঁজে সেটাকে আর আবিষ্কার করতে পারি নি। এটাই আসল রহস্য।'

'তা হলে কোকোস দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত বলা হয় কেন?'

'ওখানকার আদিম অধিবাসীরা দাবি করে, কিওটা তাদেরই প্রতিবেশী। প্রাচীন যুগে তাদের রাজার রাজধানী

আপনি কি কর্নেলকে নিয়ে......

ছিল ওই দ্বীপে। কিন্তু মুশকিল হল, 80° দ্রাঘিমাংশ এবং 20° অক্ষাংশ ছোটবড় দ্বীপের সংখ্যা প্রায় এক হাজারেরও বেশি। বারো হাজার বর্গমাইল জুড়ে ছড়িয়ে আছে তারা। মাত্র দুটো দ্বীপে বসতি আছে—বাকিগুলো জনহীন। কারণ সব দ্বীপই মানুষের বসবাসের অযোগ্য। অস্বাস্থ্যকর এবং মারাত্মক বিষাক্ত পোকামাকড়ের ডিপো। সে সব দ্বীপে যে যাবে, সাংঘাতিক ভাইরাসে সে সংক্রামিত হয়ে জটিল অসুখে মারা যাবে!'

'আপনি কি কর্নেলকে নিয়ে কিওটা দ্বীপ খুঁজতে বেরুনোর উদ্দেশ্যেই এসেছেন?'

জয়ঢাক সায়েব হাসির মাঝে ঘর কাঁপিয়ে বললেন, 'তা ছাড়া আর কি? কর্নেল সরকার আমার পুরনো বন্ধু। উদ্ভিদের গোপন কথা নামে ওঁর একটা প্রবন্ধ পেয়েই ছুটে এসেছি কলকাতায়।' [ক্রমশঃ]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের দুর্ধর্ষ এ্যাডভেঞ্চার কাহিনী

আমাজনের অরণ্যে ৮.০০

২য় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

নতুন ধরনের টেলিফোন

নারায়ণ চক্রবর্তী

প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন যন্ত্রেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। পুরনো আমলের টেলিফোন বা দূরভাষ যন্ত্রের সঙ্গে বর্তমানকালের যন্ত্রের গঠন ও ক্রিয়াকলাপে কতই না পরিবর্তন এসেছে।

বর্তমান যুগের দূরভাষ যন্ত্রের কথা বলা ও কথা-শোনার অংশ দুটি বেকেলাইটের হ্যাণ্ডেলের দুই মাথায় লাগানো থাকে। এই হ্যাণ্ডেলটি মূল যন্ত্রের ওপর রাখা থাকে, তুললেই স্প্রিংযুক্ত দুটি ছোট কালো (বা লাল বা সাদা) অংশ খট্ শব্দে উঠে যায় এবং যন্ত্রটি কাজে লাগবার উপযোগী হয়।

বর্তমান দূরভাষ যন্ত্রের প্রধান অসুবিধা হলো এই যে, যে ইনসুলেটেড্ তারটি ছোট বাক্সের আকারের মূল যন্ত্রে ও হ্যাণ্ডেলের সঙ্গে যুক্ত থাকে তা বড় জোর তিন কি চার হাত মাত্র লম্বা। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে যদিও এক্সটেনশন লাইন নেবার ব্যবস্থা আছে, তবু তা আড়িপাতার পথ প্রশস্ত করে দেয় বলে ব্যবসায়ী ও অন্যান্য অনেকের পছন্দ নয়। গোয়েন্দা কাহিনীতে এক্সটেনশেন লাইনে আড়িপাতার ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। অবশ্য লাল সাদা সবুজ হলদে নানা মন-কাড়া রঙের দূরভাষ যন্ত্র পাওয়া যাচ্ছে আজকাল। তবু কেউ ফোনে ডাকলে ফোনের কাছে এসে ফোন ধরতে হয়। এটা একটা বিরাট অসুবিধা।

এই সব অসুবিধার হাত থেকে এযুগের মানুষকে মুক্তি দেবার জন্যে এক নতুন ধরনের দূরভাষ যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা। এই যন্ত্রে কথা বলার ও কথা শোনার অংশের সঙ্গে যুক্ত হ্যাণ্ডেলটি হাতে তুলে নিয়ে স্বচ্ছন্দে এ ঘর থেকে ও ঘরে বা বসবার ঘর থেকে শোবার ঘরে চলে যাওয়া যেতে পারে, যাকে খুশী তাকে দিয়ে আনিয়ে নিতেও পারা যায়—নিজের জায়গা থেকে এক চুলও না সরেও। এ একটা বিরাট সুবিধা বই কি!

এর কারণ হচ্ছে এই যে, হ্যাণ্ডেলটি বন্দনহীন, অর্থাৎ মূল যন্ত্রের সঙ্গে তার দিয়ে সে বাঁধা পড়ে নি। মানে তারহীন হ্যাণ্ডেলটি সর্ব বন্ধন মুক্ত, একেবারে 'পরমহংস'।

তোমরা হয়তো ভাবছ তা কি করে হয়? বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ থাকলে তবেই না কথাগুলি অর্থাৎ শব্দ-

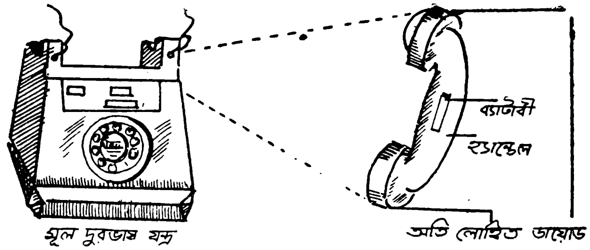

তরঙ্গগুলি বিদ্যুৎতরঙ্গে পরিণত হয়ে অপর প্রান্তে গিয়ে আবার শব্দতরঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে শ্রোতার কানে গিয়ে পৌঁছবে!

সাধারণ দূরভাষ যন্ত্রের বেলায় একথা শতকরা একশ ভাগ ঠিক। কিন্তু নবাবিষ্কৃত যন্ত্রটি যে অসাধারণ। তাই তার ধরনধারনই আলাদা।

এই বন্দনহীন দূরভাষ যন্ত্রগুলি কাজ করে বেতারের মাধ্যমে অর্থাৎ রেডিও সিগন্যাল দ্বারা। তবে যেসব দেশে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে বেতার ব্যবহার নিষিদ্ধ সেসব দেশে এই যন্ত্রটিরই রকমফের কাজ করে অতি উচ্চ কম্পাঙ্কের (ফ্রিকোয়েন্সী) শব্দতরঙ্গ দ্বারা অথবা অবলোহিত আলোকরশ্মির বিকিরণের সাহায্যে।

বন্দনহীন দূরভাষ যন্ত্রের দুই মাথায় আছে দুটি অবলোহিত (ইনফ্রা রেড) ডায়োড্। হ্যাণ্ডেলের কথা-শোনা অংশের ডায়োড্ শব্দতরঙ্গগুলি গ্রহণ করে, আর কথা-বলা ডায়োডের কাজ হলো শব্দতরঙ্গকে প্রক্ষেপণ করা। হ্যাণ্ডেলের দুই মাথায় ডায়োড দুটি আবার হ্যাণ্ডেলের ভেতরে লুকিয়ে রাখা ছোট্ট একটি ব্যাটারীর সঙ্গে আভ্যন্তরীণ তার দিয়ে যুক্ত। কথা বলা ও শোনা শেষ হলে হ্যাণ্ডেলটিকে মূল যন্ত্রের ওপর রেখে দিলেই, সেই হ্যাণ্ডেলের ভেতরে লুকিয়ে থাকা ব্যাটারিটি আপনা থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আবার, যাতে সেই গোপন ব্যাটারিটি রি-চার্জড্ হয় অর্থাৎ আবার তার বিদ্যুৎভাণ্ডার ভরে ওঠে নিজে থেকেই সে ব্যবস্থাও আছে।

অবলোহিত বা অতিলোহিত রশ্মি বিকিরণ মূল দূরভাষ যন্ত্র থেকেই হয়। যত দূর তার বিকিরণ বলয়ের সীমানা, তার ভেতরে শহরের যে কোনো অংশে এই অভিনব দূর-ভাষ যন্ত্র ব্যবহার করা চলে। এমন কি হ্যাণ্ডেলটি সঙ্গে নিয়ে গাড়ি করে ঐ সীমানার ভেতরে শহরের যে কোনো জায়গায় গিয়ে যে কারো সঙ্গে কথা বলা যেতে পারে।

অবশ্য এই নতুন ধরনের টেলিফোন যন্ত্র এদেশে এখনও চালু হয় নি।

শিমূলগ্রাম, কুলটি,

ভাইরাস

অসিতকুমার দাস

এই পৃথিবীতে কিছু কিছু বস্তু আছে যারা জড় ও জীবজগতের মাঝামাঝি অবস্থান করে। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে তাদের কোন একটি বিশেষ জগতে ফেলা যায় না। ভাইরাস এইরকমই একটি বস্তু। তবে বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে এবং ভাইরাস বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম বলে আজকাল এদের সজীব বস্তু বলে গণ্য করা হচ্ছে।

ভাইরাস একপ্রকার অতি সূক্ষ্মদেহী বস্তু। এদের আয়তন সাধারণতঃ 0·01 থেকে 0·1 মাইক্রন পর্যন্ত হতে পারে। ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এদের দেখা যায় না। এরা বিভিন্ন আকৃতির হতে পারে। যেমন— গোলাকৃতি পোলিও ভাইরাস, দণ্ডাকৃতি টোবাকো মোজেইক্ ভাইরাস, ব্যাঙাচি আকৃতি ফেজ ভাইরাস ইত্যাদি।

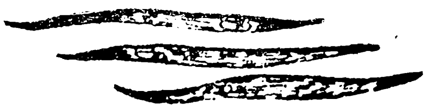

দণ্ডাকৃতি T M V

1892 খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার বিজ্ঞানী ইওয়ানোস্কি প্রথম টোবাকো মোজেইক্ ভাইরাস বা T. M. V. আবিষ্কার করেন এবং 1935 খ্রীষ্টাব্দে ওয়েন্ডেল্ ষ্টান্লি T.M.V.-কে কেলাসিত করতে সক্ষম হন। তিনি আরও দেখান যে, T.M.V.-র এই কেলাস টেস্ট্‌টিউবে রেখে দিলে বহু বছর পরও এর পোষক-কোষকে আক্রমণ করার ক্ষমতা বজায় থাকে।

ভাইরাসের গঠন অতি সরল। ভাইরাস মুখ্যত দু'টি অংশ দিয়ে তৈরী। আভ্যন্তরীণ অংশটি তৈরী হয় নিউক্লিক্ অ্যাসিড দ্বারা। এই নিউক্লিক্ অ্যাসিড রাইবোনিউক্লিক্ অ্যাসিড (RNA) হতে পারে কিংবা ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক্ অ্যাসিড (DNA) হতে পারে। দুটি একত্রে কখনই থাকে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিউক্লিক্ অ্যাসিডের একটিমাত্র অণু থাকে। বাইরের আবরণীটি তৈরী হয় প্রোটিন দ্বারা। এই আবরণীকে 'ক্যাপ্‌সিড' বলা হয়। এই ক্যাপ্‌সিড আভ্যন্তরীণ নিউক্লিক্ অ্যাসিড অণুকে রক্ষা করে। কোন কোন ভাইরাসের ক্যাপ্‌সিড আবরণীতে প্রোটিনের সঙ্গে কিছু লিপিড অণুও থাকে।

বংশবৃদ্ধি করতে হলে ভাইরাসের পরজীবিতার প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক প্রকার ভাইরাসের নির্দিষ্ট পোষক আছে। বংশবৃদ্ধির জন্যে পোষকের দেহকোষে ভাইরাস তার নিউক্লিক্ অ্যাসিডের অণুটি ঢুকিয়ে দেয়।

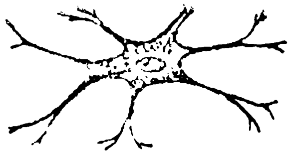

ভাইরাসের গঠন

তখন পোষক-কোষটি ভাইরাসের চাহিদা অনুসারে ভাইরাস কোষের মতোই নিউক্লিক্ অ্যাসিড অণু এবং প্রোটিন তৈরী করে। ফলে অনেকগুলি একইরকম (অর্থাৎ ভাইরাসের নিউক্লিক্ অ্যাসিডটির মতোই) নিউক্লিক্ অ্যাসিড অণু তৈরী হয়। তারপর প্রত্যেকটি নিউক্লিক্ অ্যাসিড অণুর চারপাশে প্রোটিন স্তর তৈরী হয় এবং প্রত্যেকে এক একটি পূর্ণাঙ্গ ভাইরাসে পরিণত হয়। ভাইরাস অতি দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটি পোলিও ভাইরাস 10,000 পোলিও ভাইরাসে পরিণত হয়।

ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে একপ্রকার পরজীবী ভাইরাস দেখা যায়। এদের ফেজ ভাইরাস বলে।

পোলিও, জলাতঙ্ক, পীত জ্বর, ইনফ্লুয়েন্জা, বসন্ত, সর্দি সংক্রামক যকৃৎ রোগ প্রভৃতি ভাইরাসের আক্রমণ থেকে হয়।

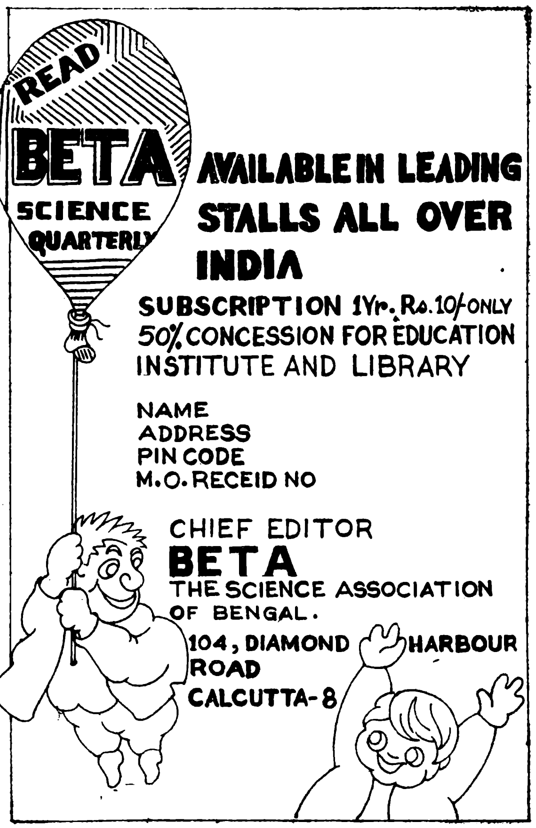

দাঁত দিয়ে যায় চেনা

সিদ্ধার্থ রায়

সুকুমার রায়ের 'গোঁফচুরি' কবিতার 'গোঁফের আমি, গোঁফের তুমি ' লাইনটা নিশ্চয়ই পড়েছ। একজন পুরাজীববিদ অথবা প্রাণিবিজ্ঞানী সেই লাইনটাকেই একটু বদলে বলবেন—'দাঁতের আমি, দাঁতের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।' শুনতে মজার লাগলেও ব্যাপারটা কিন্তু ঠিকই। প্রাণিবিদ্যার ইতিহাসে দাঁতের উদ্ভব এবং ক্রমবিবর্তন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং কয়েক কোটি বছর পুরানো প্রাণীদের গবেষণায় দাঁত এক মহামূল্যবান দলিল। এ হেন দাঁতের কাহিনী বোঝাবার চেষ্টা করা যাক।

বলা বাহুল্য, অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের দাঁত বলে কোন বস্তুই ছিল না। মেরুদণ্ডী জলচরদের মধ্যেই প্রথম দাঁতের আবির্ভাব ঘটেছিল। অবশ্য প্রথম দিকের চোয়ালহীন মাছদেরও দাঁত ছিল না। পুরাজীবীয় যুগের ডেভোনিয়ান পর্যায়ের প্রথম ভাগে, অর্থাৎ প্রায় 39 কোটি বছর আগে প্ল্যাকোডার্মি জাতীয় চোয়ালবিশিষ্ট মাছেদের জীবাশ্মতেই প্রথম দাঁতের খোঁজ পাওয়া গেছে। খাদ্য ধরা, ছেঁড়া এবং চেবানোর জন্যেই দাঁতের প্রয়োজন দেখা দেয়।

প্রথম দিকের প্রাণীদের দাঁতগুলো ছিল সমান এবং দেখতে শঙ্কুর মতন। অভিব্যক্তির ফলে ক্রমে দেখা দিল উভচর, সরীসৃপ, পাখী এবং সবশেষে স্তন্যপায়ী শ্রেণীর প্রাণী। যতই উন্নত প্রাণীদের উদ্ভব হলো, ক্রমেই একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল—দু চোয়ালের দাঁতগুলো আর সমান মাপের রইলো না, তার বদলে একই প্রাণীর মুখে অসমান এবং নানা চেহারার দাঁত গজাতে শুরু করলো। দাঁতের এই বৈচিত্র্যের কথায় যাওয়ার আগে একটা কথা অবশ্য বলে রাখা ভাল। অভিব্যক্তির একটা সাধারণ নিয়ম হলো অপরিবর্তনীয়তা অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে যে বিবর্তন ঘটে তা আবার ফিরে আসে না। নিয়মটা কিন্তু সব ক্ষেত্রেই ধ্রুব সত্য নয়। দাঁতের বিবর্তনের বেলাতেও একরকম একটা ঘটনা ঘটেছে। ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যখন উন্নততর প্রাণীদের নানা চেহারার দাঁত হচ্ছে, জলচর স্তন্যপায়ী তিমিদের কিন্তু ফের সাজানো সমান মাপের দাঁত দেখা দিয়েছিল।

আরেকটা মজার ব্যাপার হলো স্তন্যপায়ী ছাড়া বেশির ভাগ প্রাণীদের পুরানো দাঁত পড়ে, সমানে নতুন দাঁত গজায়। ফলে বৃদ্ধ বয়সে দন্তহীন হবার ভয় নেই এদের। গর্ডন এডমণ্ড নামে একজন জীববিজ্ঞানী উভচর এবং সরীসৃপ শ্রেণীর প্রাণীদের উপর পরীক্ষা চালিয়ে এই এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, সমানে এদের নতুন দাঁত বার হতে থাকে, সামনের থেকে পিছন পাটি অবধি, একের পর এক, পর্যায়ক্রমে। স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম ঘটে না। এদের স্থায়ী দাঁত একবার পড়ে গেলে আর ওঠে না। অবশ্য বেশির ভাগ স্তন্যপায়ীদেরই শিশু বয়সের দুধের দাঁত ছোট বয়সেই পড়ে গিয়ে তবে স্থায়ী দাঁত ওঠে।

এবার দাঁতের চেহারা-বৈচিত্র্যের কথায় আসা যাক। আগেই বলেছি, বেশির ভাগ সরীসৃপদের দাঁতই শঙ্কু আকারের। এরই মধ্যে অবশ্য কবচী প্রাণীভুক্ প্ল্যাকোডন্টস এবং শাকাশী ডাইনসর জাতীয় সরীসৃপদের চ্যাপ্টা ধরনের দাঁত সৃষ্টি হতে শুরু করেছিল। এর পরবর্তীকালে উদ্ভূত স্তন্যপায়ীদের মধ্যে দন্তবৈচিত্র্য ক্রমেই বেড়েছে। দাঁতের সংখ্যা, ছাঁচ ইত্যাদিও পালটেছে এদের খাদ্যাভ্যাসের উপর নির্ভর করে। চেহারা এবং কাজের দিক থেকে স্তন্যপায়ীদের দাঁত চার ভাগে ভাগ করা যায়ঃ মুখের সামনের দিকে থাকে কৃন্তক বা ইনসাইসর (সংক্ষেপে I), দেখতে ছেনির মুখের মতো কীলকাকার যার সাহায্যে খাদ্য ধরা বা কাটা যায় সহজে। কৃন্তকের দুপাশে থাকে শ্বদন্ত বা ছেদক (C) যেগুলো দেখতে শঙ্কুর মতন এবং সাধারণত বড় মাপের যার কাজ, হলো কামড় বসানো বা ছেঁদা করা। তৃতীয় ধরনের দাঁতগুলোকে পূর্বমাঢ়ী (Pm) বলে এবং সবশেষে, চোয়ালের দুই প্রান্তে থাকে মাঢ়ীর দাঁত বা পেষকদন্ত (M)। মাঢ়ীর দাঁতগুলোই দেখতে সবচেয়ে জটিল। দাঁতের উপরিভাগ বিস্তৃত এবং ঢেউ খেলানো।

স্তন্যপায়ীদের বিভিন্ন ধরনের দাঁতগুলোকে চিহ্নিত করবার জন্যে ডাক্তারী সূত্র ব্যবহার করা হয়। চোয়ালের মাঝখান থেকে শুরু করে যে কোন একটা ধার-অবধি কোন্ ধরনের কটা দাঁত উপরে এবং নিচের চোয়ালে আছে তা বোঝানো যায় এই সূত্রের সাহায্যে। মানুষের ক্ষেত্রে এই সূত্রটা হবেঃ I2/2 C1/1 Pm2/2 M3/3। এর অর্থ ঠিক মাঝখান থেকে শুরু করে উপরে এবং নিচে দুটো করে কৃন্তক, উপরে এবং নিচে একটা করে ছেদক, উপরে এবং নিচে দুটো করে পূর্বমাঢ়ী এবং তিনটে করে মাঢ়ীর দাঁত আছে। হিসাব করলে মানুষের মোট দাঁতের সংখ্যা দাঁড়ায় 32, তার 16টা উপরে আর 16টা নিচে। তোমাদের দাঁত গুণে হয়তো দেখবে আছে মোট 28টা। তার কারণ একদম ধারের চারটে মাঢ়ীর দাঁত ওঠে অনেক দেরি করে, গড়ে 27/28 বছর বয়েসে। এদেরই নাম আক্কেলমাঢ়ী।

নিচের সারণীতে কতগুলো স্তন্যপায়ী প্রাণীর দাঁতের সূত্র দেওয়া হয়েছে যা থেকে দেখতে পাবে যে, সব স্তন্যপায়ীর ক্ষেত্রে, উপরে এবং নিচের চোয়ালে একই সংখ্যক দাঁত নাও থাকতে পারে এবং চার রকমের দাঁতও হয়তো নেই।

এবার মূল প্রশ্নে ফিরে আসি। দাঁত সম্বন্ধে এই যে এত সব বৃত্তান্ত বলা হলো, তার দরকারটা কি? উত্তরটা কিন্তু অল্প কথায় দেওয়া সম্ভব। দাঁতের উপরিভাগ যে 'এনামেল' দিয়ে তৈরী, প্রাণীদের দেহে সেটাই সবচেয়ে শক্ত বস্তু। ফলে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের জীবাশ্মে, বহু সময়ই কেবল দাঁতের ছাপই স্পষ্ট পাওয়া গেছে। যেহেতু বিভিন্ন গোত্রের, বিভিন্ন প্রজাতির দাঁতের সংখ্যা এবং ধরন সুনির্দিষ্ট, এদের ছাপ দেখে সেই প্রাণীদের জীবাশ্ম চিনতে সুবিধা হয়েছে। ফলে সেই সব প্রাণীদের বিবর্তনের পুরো ছবিটাও ধরা পড়েছে জীববিজ্ঞানীদের চোখে।

এরপর 'দাঁতের আমি, দাঁতের তুমি...' বলতে আপত্তি আছে?

সারণী : কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণীর দাঁতের সূত্র

দাঁতের সংখ্যা

প্রাণী	I	C	Pm	M	মোট
মানুষ	2/2	1/1	2/2	3/3	32
বীভার	1/1	0/0	1/1	3/3	20
বিড়াল	3/3	1/1	3/2	1/1	30
কুকুর	3/3	1/1	4/4	2/3	42
ভেড়া	0/3	0/1	3/3	3/3	32
ইঁদুর	1/1	0/0	0/0	3/3	16
ঘোড়া	3/3	1/1	4/4	3/3	44
কাঠবিড়ালি	/1	0/0	2/1	3/3	⁄2

37/2 গড়িয়াহাট (সাউথ), কলি-700031

ফ্লোরেল এবং অ্যালুমিনিয়াম পোষাক

কমলকুমার দাস

আ-গু-ন, আ-গু-ন—আগুনের লেলিহান শিখায় সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে. আর ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীরা তা নেভাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারছে না।

এইভাবে কলকারখানা, ঘরবাড়ি স্থলযান, জলযান, এমন কি উড়োযানও আগুনের গ্রাস থেকে মুক্তি পাচ্ছে না, যেমন মুক্তি পাচ্ছে না অসংখ্য অসহায় নর-নারী, শিশু এবং অবলা পশু, পাখি প্রভৃতি প্রাণী এবং বস্তু।

অথচ এই আগুন আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় একটি অপরিহার্য বস্তু। সারা দিনে আমাদের কতবার যে আগুন জ্বালাবার প্রয়োজন হয় তা সঠিক করে বলা শক্ত! অনেক সময় আবার আমরা আগুন নিয়ে খেলা করি, কিন্তু অত্যন্ত সতকর্তার সঙ্গে। কিন্তু এত সর্তকতায় সত্ত্বেও কখন যে আগুন আমাদের আকর্ষণ করে তা আমরা বুঝতে পারি না। যখন তা বুঝতে পারি তখন তার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আমরা নানা উপায় অবলম্বন করি। যখন কোনো উন্মুক্ত স্থানে আগুন লাগে তখন সেখানে জলের সাহায্য নিই. যখন বদ্ধ স্থানে লাগে, তখন কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস-এর সাহায্য, এবং যখন আমাদের কারোর দেহে আগুন লাগে তখন মাটিতে গড়াগড়ি দিই, কিংবা বালিশ, কাঁথা, কম্বল প্রভৃতির সাহায্য নিই। কিন্তু এই সব অবলম্বন তুচ্ছ করে অনেক সময় আগুন আমাদের সর্বস্ব পুঁড়িয়ে ছাই করে দেয়।

আগুনের এই ধ্বংসের হাত থেকে সমাজের মানুষ, কলকারখানা প্রভৃতিকে বাঁচাতে গেলে আমাদের প্রয়োজন শক্তিশালী অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি।

বর্তমানে বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিতে মানুষ আবিষ্কার করেছে "ফ্লোরেল" নামক একপ্রকার তরল পদার্থ। এটি এমনি গুণসম্পন্ন যে যাতে প্রলেপ দেওয়া থাকলে আগুন আক্রমণ করতে পারে না। এ ছাড়া ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীদের আগুন নেভাবার কাজে সুবিধার জন্যে একপ্রকার উন্নতি ধরনের ধাতু নির্মিত (অ্যালমিনিয়াম) পোষাক তৈরী হয়েছে যা পরিধান করে নির্ভয়ে আগুনের ভিতর দিয়ে যাওয়াআসা করা যায়। বর্তমানে এই ধরনের পোষাকের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়েছে মুলত ফায়ার ব্রিগেডের কমীদের মধ্যে।

সাহাপুর হরেন্দ্রনাথ বিদ্যাপীঠ, কলকাতা-31

যদি চাঁদ না থাকত?

হীরক দাশ

চাঁদ। পৃথিবীর একমাত্র প্রকৃত উপগ্রহ। এর জন্ম কিভাবে হয়েছিল তা নিয়ে অবশ্য নানা মুনির নানা মত। বেশ কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে চাঁদ সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবী থেকে। পৃথিবী যখন জ্বলন্ত অবস্থায় ছিল তখন তার দেহ থেকে কিছু অংশ বের হয়ে গিয়ে চাঁদ সৃষ্টি হয়েছে এবং এর ফলে পৃথিবীর বুকে প্রশান্ত মহাসাগরের মতো বিরাট খাদ তৈরি হয়েছে। অন্যদের মতে, সৌর-জগতের সৃষ্টির সময় আলাদাভাবেই চাঁদের জন্ম হয় এবং পৃথিবীর সেই আদিকাল থেকেই চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র সঙ্গী। তবে যে যাই বলুক, চাঁদ ছাড়া এই পৃথিবীর যে কি অবস্থা হত তা জানা না থাকলে তোমরা বোধ হয় আন্দাজও করতে পারবে না। এখন পৃথিবীর আকাশে চাঁদ না থাকলে কি অবস্থা হত তা দেখা যাক। তবে প্রথমে চাঁদ সম্বন্ধে কিছু জেনে রাখা ভালো।

চাঁদের ব্যাস প্রায় 3500 কিলোমিটার, পৃথিবীর ব্যাসের চারভাগের এক ভাগের চাইতে সামান্য বেশি। আর এর সমগ্র ভূপৃষ্ঠের আয়তন উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মিলিত আয়তনের চাইতে কম। চাঁদ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে প্রায় 4 লক্ষ কিলোমিটার দূর থেকে 271/3 দিনে একবার প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীর ভার চাঁদের ভরের চাইতে 81 গুণ বেশি এবং আয়তন 50 গুণ বেশি। চাঁদ পৃথিবীকে নানানভাবে সাহায্য করে। যেমন, রাতের বেলা আলো দেয় এবং পৃথিবীর সমুদ্রে জোয়ারভাটা তোলে। সাধারণত চাঁদ ও সূর্যের মিলিত টানে (আকর্ষণে) জোয়ার-ভাটা ওঠে। তবে চাঁদের টানটাই প্রধান। প্রায় দুই তৃতীয়াংশ। চাঁদের এই টানের ফলে চাঁদের সরাসরি নিচের অর্থাৎ যেদিকে টান সেদিকের সমুদ্রে এবং এর উল্টোদিকে সমুদ্রে ওঠে জোয়ার। আর এই দু'এর দু'পাশে থাকে ভাটা। এখন পৃথিবী তার অক্ষের চারপাশে পশ্চিম থেকে পূর্ব পাক খাচ্ছে। তাই চাঁদের ক্রমাগত টান থাকার ফলে চাঁদের নিচের সমুদ্রের জলের (জোয়ারের) চূড়ো পৃথিবীর পাক খাওয়ার উল্টোদিকে– পূর্ব থেকে পশ্চিমে—সরতে শুরু করে। ফলে পৃথিবীকে ঘিরে একটা বিরাট জলের প্রবাহ তৈরি হচ্ছে, যার গতিপথ পূর্ব থেকে পশ্চিমে অর্থাৎ পৃথিবীর পাক খাওয়ার উল্টোদিকে। এর ফলে প্রতিদিন জলপ্রবাহের গতিবেগ এবং পৃথিবীর আহ্নিক গতিবেগের মধ্যে একটা ঘর্ষণ ঘটছে। এজন্যে পৃথিবীর আহ্নিক গতিবেগ ক্রমাগত কমে আসছে অর্থাৎ পৃথিবীর 'দিন' একটু একটু করে বড় হচ্ছে। তবে এই 'একটু' খুবই-ই সামান্য। প্রতি একশ' বছরে পৃথিবীর 'দিন' বড় হচ্ছে এক সেকেণ্ডের এক হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই ঘটনা কিন্তু ঘটে আসছে পৃথিবীর সেই আদিযুগ থেকে।

জন্মকালে পৃথিবীর আহ্নিক গতিবেগ বর্তমানের চাইতে অনেক বেশি ছিল। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, আজ থেকে 400 কোটি বছর আগে পৃথিবীতে দিন ও রাত আজকের তুলনায় অনেকাংশ কম ছিল। সে অবস্থা ভাবো তো? দিনের বেলায় তখন ছিল যেমন গরম রাতে তেমন ঠাণ্ডা। কিন্তু ভাগ্য ভালো চাঁদ পৃথিবীর সঙ্গী ছিল বলে পৃথিবীর এই প্রচণ্ড আহ্নিক গতিবেগকে সেই সময় থেকে ধীরে ধীরে কমিয়ে আজ এই অবস্থায় এনেছে অর্থাৎ এখন 24 ঘণ্টায় এক 'দিন' হয়। সুতরাং চাঁদ না থাকলে পৃথিবীর এই 'পাগলামি' থামাত কে?

পৃথিবীতে প্রথম প্রাণী এসেছে জলে। তারপর তারা উঠে আসে ডাঙ্গায়। প্রাণীদের জল থেকে ডাঙ্গায় উঠে আসার এই অভিযোজনের পেছনে চাঁদ অনেকাংশে দায়ী। সেসময় চাঁদের অবস্থান পৃথিবীর অনেক কাছে ছিল বলে পৃথিবীর জলভাগে জোয়ার-ভাটার বেগ ছিল প্রচণ্ড। এই জোয়ারে সমুদ্রের জলের সঙ্গে সেসময়কার যে সব সামুদ্রিক প্রাণী ডাঙ্গার উপর চলে আসত ভাটার সময় শুকনো ডাঙ্গায়ই পড়ে থাকত। ফলে তাদের বেশি ভাগ মারা পড়ত, কিন্তু কিছু প্রাণী শুকনো ডাঙ্গার উপর এই অসহায় অবস্থায় বেঁচে থাকাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেত। এই সব প্রাণীদের ডাঙ্গার উপর বায়ুমণ্ডল থেকে সরাসরি বাতাস গ্রহণ করে বাঁচার এই সংগ্রাম সফল হওয়ার ফলে জন্ম নেয় উভচরেরা—যারা জল ও ডাঙ্গায় বাস করতে সক্ষম এবং এদের থেকেই আরও পরে ডাঙ্গার ফুসফুসধারী প্রাণী সৃষ্টি হয়। আর চাঁদ যদি না থাকত তবে পৃথিবীতে জোয়ার-ভাটা না হওয়ার দরুন উভচর প্রাণীদের জন্ম হয়তো সম্ভবপর হত না। আজ পৃথিবীতে থাকত না মানুষ নামে এই প্রাণীটিও। সুতরাং চাঁদের উপস্থিতির জন্যে আজ পৃথিবীর মাটিতে ডাঙ্গার প্রাণীদের ক্রমবিকাশ সম্ভব হয়েছে।

চাঁদশূন্য পৃথিবীতে সব সময়ই থাকত এক দিকে আলো এবং তার উল্টো পিঠে ঘুটঘুটে অন্ধকার। রাতে লোডশেডিং-এর সময় রাস্তাঘাটে সেই অন্ধকারে লোক কি ভাবে চলাফেরা করত ভাবো তো? তখন থাকত না কোন তিথি। হত না পূর্ণিমা, অমাবস্যা বা একাদশী। বিজ্ঞানীদেরও মস্ত অসুবিধেয় পড়তে হত। কারণ তাঁরা তখন সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণ দেখবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতেন। চন্দ্র-অভিযান চালানো অসম্ভব হত। সুতরাং রকেট-বিদ্যাও খুব একটা অগ্রগতি লাভ করত না। আর কবি-সাহিত্যকদের অবস্থা? চাঁদ নিয়ে কোন কবিতাই লেখা হত না, সৃষ্টি হত না জুল ভের্ন-এর সেই বিখ্যাত 'পৃথিবী থেকে চাঁদে' কল্পবিজ্ঞানের উপন্যাস।

30/10 সেলিমপুর রোড, কলকাতা-31

ছোটদের দপ্তর

পরিচালনায় **জয়ন্ত দত্ত**

মে-’83 সংখ্যায় বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার যারা সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে

24-পরগণা ঃ শৌভিক রায়। **হুগলী ঃ** কুনাল সেনগুপ্ত, অনামিকা সাহা, রমিত বোস, দেবাশিস সাহা, ঝুনু মণ্ডল, বনশ্রী মণ্ডল, আশিসকুমার সাহা, কুশল ঘোষ, আশিস ঘোষ, সুবীর গুহ, সৌরভ সরকার। **হাওড়া ঃ** গৌতম জানা, হারুকুমার দাস, দেবাশিষ ঘোষ, তন্ময় চৌধুরী। **নদীয়া ঃ** রমেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও অন্যান্য, রতনকুমার বাড়ৈ ও অন্যান্য, বাপি মণ্ডল ও অন্যান্য, বিধানচন্দ্র মণ্ডল, স্বপ্না বিশ্বাস ও অন্যান্য, রামানুজ শর্মা ও অন্যান্য, সুজিতকুমার খাঁ, সুভাষচন্দ্র আগরওয়ালা। **মেদিনীপুর ঃ** দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও অন্যান্য, বিশ্বনাথ রায়, স্বপনকুমার মাহাতো ও অন্যান্য, জয়নাথ সরকার, তুষারকান্তি পাল, ফণীন্দ্রনাথ হাঁসদা, ভবেশচন্দ্র মাহাতো, ফণীন্দ্রনাথ দাস, শংকর মণ্ডল, অমিয়কান্তি বিশ্বাস, সঞ্জয় নন্দী, শক্তিপদ পাল, নীতিশচন্দ্র রায়, অলোক চক্রবর্তী, বিপুলকুমার কীর্তনীয়া, নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যমুনাকান্ত সিং, দিলীপ সিংহ, সমীরকুমার ভট্টাচার্য, স্বদেশরঞ্জন মাহাতো ও অন্যান্য, প্রসাদকুমার কর ও অন্যান্য, কিংশুক হালদার। **মুর্শিদাবাদ ঃ** বিবেকানন্দ সরকার, সুমন সরকার। **বর্ধমান ঃ** অপূর্ব দেব। **বাঁকুড়া ঃ** সৌমেন সরকার, কাকলি সরকার, মানসী ঘোষ।

বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা মে-’83 সংখ্যার যারা দশ বা তার বেশী প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে

কলকাতা ঃ বিশ্বজিৎ সরকার, শৌভিক নন্দী, কৌশিক নন্দী, সুমন দাশ, দেবজিৎ নন্দী, মলয় দাশ, অজয়েশ ঘোষাল, তন্দ্রা দাশ, প্রণবকুমার সরকার, সুপর্ণা সরকার, রুমকি সরকার, অভীক কুণ্ডু, চন্দনা হালদার, মিতা মণ্ডল ও অন্যান্য, পুষ্পেন্দুনারায়ণ লাহিড়ী, জ্ঞানপ্রকাশ মজুমদার, রক্তিমা সান্যাল।

হাওড়া ঃ শেলী দাস, রীতা ভট্টাচার্য, সোনালী ব্যানার্জী, সুভাষচন্দ্র রায়চৌধুরী, অসিতকুমার রীত, তাপসকুমার রীত, ধূর্জটিপ্রসাদ সাহু, মিতালী সাহু, মানস রায়চৌধুরী, সুবীর ভট্টাচার্য, শম্পা ভট্টাচার্য, শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থসারথি দাঁ, সুরজিৎকুমার পোড়েল, শ্যামল প্রামানিক, এ. টি. এম. মোদাব্বের হোসেন, অমিতাভ মান্না।

24-পরগণা ঃ সৌমিত্র রায়, তমাল ঘটক, সমীরণ বিশ্বাস, সুগত দত্ত, সুপ্রিয় বিশ্বাস, শংকর বিশ্বাস, শুভঙ্কর বিশ্বাস, ইন্দ্রপ্রসাদ দে, সৌমিত্র মজুমদার, মমি পাল, অলোকেশ চক্রবর্তী, অলক দাশ, তাপসকান্তি সিন্‌হা, সোমনাথ ঘোষ, গোপাল সাহা, সোমা চৌধুরী, বিনয়কুমার ভট্টাচার্য, প্রতিমা ভট্টাচার্য, আশিস রায়, রাণ্টু মজুমদার, বিপ্লবকুমার ভট্টাচার্য, প্রদীপ্ত মিত্র।

হুগলী ঃ সলিল দে, মিঠু মল্লিক, শমিতা মল্লিক, মনোজকুমার সেন, তারকনাথ দে ও অন্যান্য, যমুনা শীল, অভিজিৎ দত্ত, মনজিৎ দত্ত, শুভেন্দু দে, প্রণবকুমার ভট্টাচার্য, শর্মিষ্ঠা অধিকারী, শুভাশিস ঘোষ, রাণা কিলিকদার, রাজা কিলিকদার, সুনীতবরণ ভট্টাচার্য।

বর্ধমান ঃ প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, মোঃ সুফিয়া রহমান, সীমান্ত রায়, আনন্দময় গোস্বামী, তাপস তা, অভিজিৎ দাস, অশ্রুজিৎ দাস, দীপক পোদ্দার, পুতুল ও অন্যান্য, মৃত্যুঞ্জয় পাল, চিন্তাহরণ রায়, সুব্রত ঘোষ, অতীন্দ্রনাথ মিশ্র, রবিব্রত ঘোষ, ফাল্গুনী দাস, মহামায়া দাস, সুমিতা হাজরা ও অন্যান্য, বিক্রম ঘোষ, তাপস রায় ও অন্যান্য, সুতপা ভট্টাচার্য, ভাস্কর চক্রবর্তী, সুরজিৎ ভট্টাচার্য, অভিনয় কোনার, পুষ্পেন্দু কোনার, অলোক ভট্টাচার্য, অনিমেষ ব্যানার্জী, অমর্ত্য ব্যানার্জী, প্রসেনজিৎ মৈত্র।

47 পাতায় শেষাংশ

ঘোষণা

ছোটদের দপ্তরে বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার অনেক উত্তর দেরিতে এসে পৌঁছনোর ফলে উত্তর সঠিক হওয়া সত্ত্বেও অনেকের নাম প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই তোমরা যারা বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার উত্তর পাঠাতে ইচ্ছুক তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে চলতি মাসের 15 তারিখের মধ্যে বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার উত্তর পাঠাতে। 15 তারিখের পর বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার উত্তর পাঠালে তাদের নাম প্রকাশ করা সম্ভব হবে না।

পরিচালক ঃ ছোটদের দপ্তর

জানা অজানা

গাইড মাছ

অনুপম মুখোপাধ্যায়

হাঙরের নাম তো আমরা সবাই-ই শুনেছি। সমুদ্রের বুকে যাদের বাস আর যাদের খাদ্য অন্য নানা ধরনের সমুদ্রের প্রাণী। এদের খাদ্যতালিকায় মানুষও যে অন্তর্ভুক্ত তাও আমরা জানি। কিন্তু এই বড় বড় জীবন্ত বিভীষিকাগুলোর গতি নিয়ন্ত্রণ করে, খাদ্যের সন্ধান দেয় যে ছোট ছোট মাছ তাদের কথা আমরা কজনই বা জানি। আমি সেই মাছেদের সম্পর্কেই বলব।

এই মাছগুলোকে বলা হয় গাইড মাছ। আকৃতিতে এক ফুটের বেশি বড় হয় না। এদের দেহের রঙ কালো। এরা হাঙরের মাথার উপর দিকে শক্তভাবে আটকে থাকে। আসলে হাঙরের চোখ দুটো মাথার উপর দিকে হওয়ায় এরা সামনের দিকের কোন জিনিসকে দেখতে পায় না, কেবলমাত্র উপরের দিকের বস্তুগুলোকে দেখতে পায়। সামনের দিকে কোন জিনিস সম্পর্কে এরা নির্দেশ পায় গাইড মাছেদের কাছ থেকে। গাইড মাছগুলো ডানদিকে অথবা বাঁদিকের বাঁকলে হাঙর মাছও যথাক্রমে ডানদিক অথবা বাঁদিকে বাঁকে। গাইড মাছগুলোর

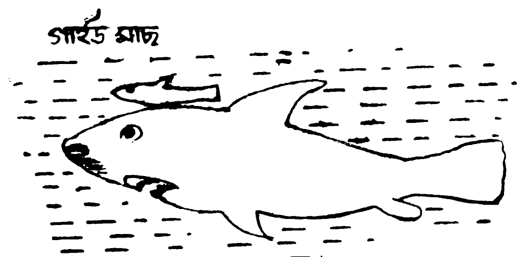

নিচের দিকটা খুব খসখসে হয়। এই অংশের সাহায্যেই এরা হাঙরের মাথার উপর দৃঢ়ভাবে আটকে থাকে। এরা এত দৃঢ়ভাবে হাঙরের গায়ে আটকে থাকে যে দুজন মানুষের পক্ষেও তাকে হাঙরের মাথার উপর থেকে টেনে তোলা সব সময় সম্ভব হয় না। এদের গায়ে আঁশ থাকে না। হাঙরের খাদ্যই এদের খাদ্য। অন্ধের যষ্ঠির মতো কাজ করে এই ছোট ছোট মাছগুলো।

নারায়ণদাস বাঙ্গুর, মেমোরিয়াল স্কুল দমদম, 24 পরগনা।

ফেরোমেন

স্বপন ভট্টাচার্য

কথায় বলে 'পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে'। কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু পাখা থাকলেই কি মরতে হয়। তা হলে পাখিরও তো পাখা বা ডানা থাকে। শুধুমাত্র ডানাওয়ালা পিঁপড়েই নয়, অনেক কীটপতঙ্গই স্বেচ্ছায় আগুনে আত্মাহুতি দেয়। এর পিছনে একটি বৈজ্ঞানিক কারণ আছে যা আমাদের দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায়।

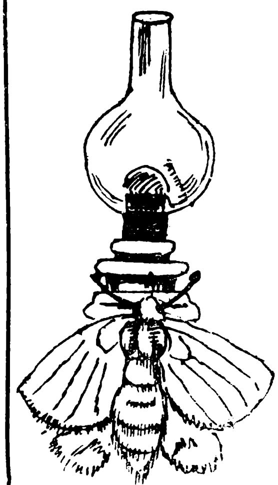

আমরা জানি যে, উদ্ভিদ এবং উচ্চস্তরের প্রাণী ছাড়াও কীটপতঙ্গের শরীর থেকেও বিভিন্ন হরমোন ক্ষরিত হয়। ঐ সব হরমোন কীটপতঙ্গের খোলস ত্যাগে, পূর্ণতা প্রাপ্তিতে সহায়তা করে। 'ফেরোমেন' এমন একটি হরমোন যার দ্বারা কীটপতঙ্গরা তাদের স্বজাতির অস্তিত্ব আঁচ করতে পারে। এই ফেরোমেন একটি উগ্রগন্ধ-বিশিষ্ট হরমোন। এখন এই ফেরোমেন হরমোন থেকে অবলোহিত বিকিরণ অর্থাৎ ইনফ্রা-রেড বিকিরণ হয়। আবার হাইড্রোকার্বন এবং বৈদ্যুতিক আলোর জ্বলনে ঐ ইনফ্রা-রেড বিকিরণ হয়। এইজন্যেই বিভিন্ন কীটপতঙ্গ ভুল করে তাদের স্বজাতীয় খোঁজে আগুনের কাছে ছুটে আসে এবং প্রাণ দেয়।

170 জি টি রোড শেওড়াফুলি, হুগলী।

নিজে নিজে কর

ড্রয়িং ক্যামেরা

সুবীর বিশ্বাস

তোমরা অনেকেই হয়তো ছবি আঁকতে পার। তবে সবাই নিশ্চয়ই পার না। আজ তোমাদের এমন একটা পদ্ধতির কথা বলব, যা থেকে তোমরা অতি সহজেই সকলে ছবি আঁকতে পারে।

প্রথমে একটা কাঠের অথবা পিচবোর্ডের বাক্স জোগাড় কর যেটা দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতায় যেন প্রায় 7-8 ইঞ্চি

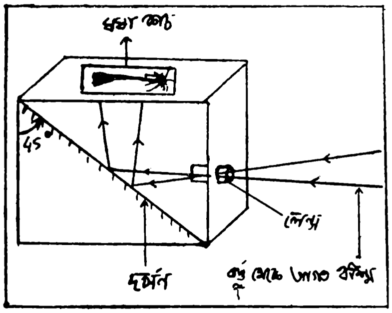

ড্রয়িং ক্যামেরা

হয়। আর একটা আয়না লাগবে যেটা চওড়ায় ঐ বাক্সের সমান হবে এবং দৈর্ঘ্যে হবে প্রায় 9·5 ইঞ্চি হয়। আর লাগবে দুটো লেন্স। এ দুটো তোমরা যে কোন দোকানেই কিনতে পাবে। এছাড়া লাগবে কিছু কালো কাগজ, আঠা, একটা কাচের স্ল্যাব, ট্রেসিং পেপার ইত্যাদি। এবার কাজ আরম্ভ করা যাক।

বোর্ডের বাক্সটার একদিকে একটি ফুটো করো যার ব্যাস প্রায় লেন্সের ব্যাসের সমান হয়। এখন একটুকরো কাগজকে পাকিয়ে এমন করো যাতে ওর ভেতর লেন্সদুটো ঢুকে যায়। এবার ঐ কাগজের চোঙের ভেতরে লেন্স-দুটোকে $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি দূরে বসিয়ে দিয়ে ভালভাবে আটকে দাও। এইবার ঐ চোঙটাকে বাক্সের গর্তে ঢুকিয়ে দাও যেন ঐ চোঙটাকে আগু-পিছু করা যায়। বাক্সের ওপরে ঠিক মাঝখানে প্রায় 4″×4″ একটা চৌকা গর্ত কর। এবার তোমার কাচের টুকরোটা ভালভাবে আঠা দিয়ে আটকে দাও। এর আগে দর্পণটাকে নিয়ে বাক্সের কোনাকুনিভাবে ছবির মতন 45° কোণে বসিয়ে দাও। ভেতরের জিনিস সব লাগানো হয়ে গেলে এবার সমস্ত বাক্সটাকে কালো কাগজে মুড়ে দাও। ব্যাস তোমার ক্যামেরা তৈরি।

এবার চলে এসো খোলা জায়গায়। মনে কর, তুমি একটা তালগাছের ছবি আঁকবে। ক্যামেরার লেন্সকে গাছের দিকে মুখ করে বসাও। এবার একটা ট্রেসিং পেপারকে কাচের স্ল্যাবের ওপর রেখে তুমি লেন্সটাকে আগু পিছু করতে থাক। একসময় দেখবে যে, গাছের একটা স্পষ্ট এবং ছোট প্রতিবিম্ব তোমার ক্যামেরায় পড়ছে। ব্যাস্ এবার পেন্সিল দিয়ে ট্রেসিং পেপারে ঐ ছবি এঁকে ফেল।

দমদম কৃষ্ণকুমার হিন্দু আকাডেমি

---

45 পাতার শেষাংশ

মেদিনীপুরঃ অনন্ত ব্যানার্জী, লক্ষ্মীকান্ত ব্যানার্জী, শ্রীকান্ত ব্যানার্জী, সর্বানী ষড়ঙ্গী ও অন্যান্য, অভিজিৎ রাজ, অরিজিৎ রাজ, মহাদেব দাস, প্রভাতকুমার গিরি, সৌমেনকুমার গিরি, সুচরিতা মিত্র ও অন্যান্য, নীতা বিষ্ণু, শুক্লা সিং, শিখারানী মাজী, গুণধর মাইতি।

নদীয়াঃ পারমিতা রায়, দেবাশিস মণ্ডল, সিদ্ধার্থ মণ্ডল, পরিতোষ মণ্ডল, কানু পাকড়াশী, সুবীর চক্রবর্তী ও অন্যান্য। **বীরভুম**ঃ বিদ্যুৎ রায়, প্রদ্যুৎ রায়, শরৎ গড়াই, প্রলয় বৈদ্য, কাঞ্চন রায়, চিরঞ্জীব ঘোষ, প্রণতি মণ্ডল, রবিউল ইসলাম, মোহেবুর রহমান, পার্থপ্রতিম দত্ত, পাপু মজুমদার, জীবন নাগ, অমিত নাগ।

বাঁকুড়াঃ অশোক দে, অজয় মিশ্র ও অন্যান্য।

মুর্শিদাবাদঃ চিন্ময় মুখোপাধ্যায়, শুভাশিস মুখোপাধ্যায়, দেবোপম ভট্টাচার্য, সঞ্জীব সরকার, পার্থ সান্যাল, পলাশ মোহান্ত, বিকাশ মোহান্ত, মানস মোহান্ত।

মালদহঃ সরিৎকুমার দাস, দীপ্তেন্দু ঘোষ, দীপ্তার্ক দত্ত, জয়ন্ত চ্যাটার্জী। **জলপাইগুড়ি**ঃ জয়জিৎ লাহিড়ী।

কোচবিহারঃ দীপঙ্কর মুখার্জী।

আসামঃ ডিব্রুগড় ॥ পার্থপ্রতিম দাস, রঞ্জিত দাস, রাহুল দাস। **বিহার**ঃ ধানবাদ ॥ শুভম মিশ্র।

ওড়িষাঃ রাউর কেলা ॥ চঞ্চল ভট্টাচার্য।

শব্দকূট / স্বাতী রায়

1 অ্য	2 *	4 নি	য়া	■
■	না	9 কো	*	ন
■	জ্যা	6 *	ন	■
5 পা	ই	ন	■	8 সী
■	7 ট	*	■	*

পাশাপাশি ঃ 1. একটি যৌগিক গ্যাস। 5. একটি উদ্ভিদের নাম। 6. একটি ধাতুর নাম। 7. এর মান 20 হন্দরের সমান।

9. ক্ষুদ্রান্ত্রের নিম্নাংশ থেকে অপেক্ষাকৃত মোটা নল যা ডান দিক থেকে সোজা ওপরে উঠে ঘুরে আবার বাঁ দিক থেকে নিচে নেমে গেছে।

উপর নিচে ঃ

2. একপ্রকার খনিজ পদার্থ যার মধ্যে সিরিয়াম, থোরিয়াম ও বিভিন্ন 'রেয়ার আর্থ' ধাতু মিশ্রিত থাকে।

4. তামাক পাতা থেকে এই উপক্ষারটি (চার অক্ষরে নাম) নিষ্কাশন করা হয়।

8. একপ্রকার সামুদ্রিক প্রাণী।

গত সংখ্যার শব্দকূটের সমাধান

				1				
	■	■	5	4	0	■	2	
	■	■	■	9	■	1	8	
	5	8	9	3	■	6	■	
1	7	9	1	■	1	7	3	6
	1	2	6	■	8	5	■	
	■	■	4	■	9	■	■	
	■	■	2	1	2	■	■	

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

অমরনাথ রায়

1. রসায়নশাস্ত্রে ABC বলতে কি বোঝায়?
2. একটি পূর্ণবয়স্ক বিড়ালের মুখে কয়টি দাঁত থাকে?
3. সাপের চোখের পাতা আছে কি?
4. রেডিও ভাল্‌ব-এর আবিষ্কর্তা কে?
5. ট্রাই প্লাম্বিক টেট্রক্সাইডের অপর নাম কি?
6. বর্ণান্ধতার অপর নাম কি?
7. এমু পাখি কোন্ দেশে পাওয়া যায়?
8. তারাপুর পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রটি ভারতের কোন্ প্রদেশে অবস্থিত?
9. 80% সোনার সঙ্গে 20% রূপা মেশালে যে সংকরধাতু উৎপন্ন হয়, তার নাম কি?
10. SAC বলতে কি বোঝায়?
11. Slide Rule-এর আবিষ্কর্তার নাম কি?
12. মানুষের হাত তৃতীয় শ্রেণীর লিভার। এই লিভারের আলম্ব থাকে কোথায়?
13. মাধ্যমের উষ্ণতা বাড়লে শব্দের বেগ বাড়ে না কমে?
14. রান্নার কোন্ উপাদানে 'ক্রিম অফ টার্টার' ব্যবহৃত হয়?
15. স্কটল্যাণ্ড-এর জাতীয় প্রতীক একটি উদ্ভিদ। সেই উদ্ভিদটির নাম কি?

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা মে-83 এর সমাধান

1. কমে। 2. ল্যাক্টো ব্যাসিলাস। 3, স্থলজ উদ্ভিদের পাতায় যে ছিদ্র থাকে সেগুলিকে 'স্টোমা' বলে। 4, Indian National Satellite System, 5, মুখ বিবর থেকে নিঃসৃত হয়। 6, অগ্ন্যাশয়। 7, এদের শুঁড় স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাজ করে। 8, তার মোটা হলে রোধ কম হয়। রোধ কম হলে তড়িৎ প্রবাহমাত্রা বাড়ে। ট্রাম বা ট্রেন চালাবার জন্যে জোর তড়িৎপ্রবাহ মাত্রা দরকার। 9, তড়িৎপ্রবাহ দ্বিগুণ করলে উত্তাপের পরিমাণ 4 গুণ হবে, কারণ $H \propto C^2$ 10, বট ও রবার গাছের স্তম্ভমূল আছে। 11, H_3BO_3 12, এক একটি ফুল। 13, এক্স রশ্মির। 14, ইংরেজ বিজ্ঞানী র‍্যামজে এবং ট্রেভারস্। 15, এক সমকোণ $= \frac{\pi}{2}$ রেডিয়ান $= 90°$

ভেবে ভেবে বল

শুভব্রত রায়চৌধুরী

1. নিচের দুটি বাক্যের মধ্যে কোন্‌টি ঠিক একটু ভেবে বলো !

(ক) ভিটামিন -ডি আমাদের শরীরের ক্যালসিয়াম গ্রহণ করতে সাহায্য করে ।

(খ) ভিটামিন—ডি মানবদেহের রক্তসঞ্চালন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখে ।

2. নিচের ছবিতে একটি মানুষের চোখ এবং চোখের উপর লিচুর মতো করে সাজানো একটা গ্লাণ্ড দেখা যাচ্ছে। গ্লাণ্ডটির নাম বলো ।

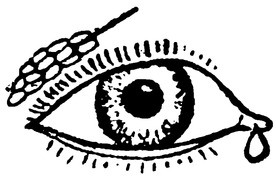

3. (ক) সূর্যশিশির (খ) জবাফুল ; (গ) কলসপত্রী (ঘ) সূর্যমুখী। এদের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ উদ্ভিদ পোকামাকড় শিকার করে ?

4. ওপরে তিনটি কোষের ছবি দেখানো হয়েছে । এদের নামগুলো ভেবে বলো ।

5. একটি টেবিলে তিনটি বোতলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রিক অ্যাসিড আছে । কোন্‌ বোতলটিতে কি আছে জানা নেই। নিচের কোন্‌ পদার্থটি দিয়ে একবার পরীক্ষা করে সালফিউরিক অ্যাসিড সনাক্ত করা যায় । ভেবে বলো।

(ক) ফিনলফ্‌থেলিন ; (খ) সিলভার নাইট্রেট ; (গ) বেরিয়াম ক্লোরাইড (ঘ) গ্লুকোজ ।

6. LASER রশ্মি আমরা নাম শুনেছি । এই LASER কথাটির পুরো অর্থ কি ভেবে বলো।

ভেবে বলো উত্তর ;

1. (ক) 2. টিয়ার গ্লাণ্ড 3. (ক) ; (গ)
4, রক্তকোষ ; পেশীকোষ ; স্নায়ুকোষ 5. (গ)
(ক) (খ) (গ)

6. LIGHT AMPLIFICATION STIMULATED EMISSION RADIATION

104, ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলিকাতা-8

।। ভেজাল ধরার উপায় ।।

দিব্যদ্যুতি দাশ

বর্তমানে প্রায় সকল রকমের খাবারে ভেজাল পাওয়া যায় । তাই আমার সহপাঠী বাবলা, বিজন, বুবু ও সুজিত সবাই বললো, ঃ একটা ভেজাল ধরার উপায় বার করলে কেমন হয় ? আমি বললাম ; আমি একটা ভেজাল ধরার উপায় জানি ।

শোন, তবে সেই ভেজাল ধরার উপায় । স্নেহ জাতীয় খাবারের মধ্যে যেমন ঘি, ডালদা, মাখন এবং সর্ষের তেলে কেমন করে ভেজাল ধরা যায় । ভেজাল ধরার জন্যে কয়েকটা জিনিসের দরকার । যেমন— (ক) গোটা কয়েক টেষ্ট টিউব (খ) খানিকটা গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড, গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, (গ) একটু চিনি ও একটি ড্রপার । সব তো জোগাড় করে আনা হলো, এবার পরীক্ষা করা যাক ।

প্রথমে যেটা আমাদের প্রতি দিনের রান্নায় প্রয়োজনীয় উপাদান – সর্ষের তেল, এর থেকে কি করে ভেজাল বার করতে হয় তাই পরীক্ষা করে দেখাচ্ছি। একটা টেষ্ট টিউবে কিছু সর্ষের তেল নিলাম তারপর ড্রপারে করে তেলের থেকে কিছু কম গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড টিউবের মধ্যে ঢাললাম । তার একটু পরে অ্যাসিড টিউবের একেবারে তলায় চলে গেল আর তেলটা থাকল উপরে । কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যে, অ্যাসিড ও তেলের মিলন স্থলে কালচে গোলাপী আকার নিল (অবশ্য তেলটা আমরা ভেজালই নিয়ে ছিলাম যাতে পাঠক পাঠিকাদের বোঝানো যায়) এবং বুঝতে পারলাম তেলে ভেজাল আছে ।

ডালদায় ভেজাল বার করা । ঐ একই রকমভাবে টেষ্ট টিউবে ডালদা গলিয়ে নিয়ে ড্রপারের সাহায্যে গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড নেওয়া হলো । এবারেরও ডালদা উপরে ও অ্যাসিড নিচে । উভয়ের মিলন স্থানে বাদামী রঙের আভা দেখা গেল। অতএব বোঝা গেল ডালদার চর্বি মেশানো আছে (বলে রাখি ডালদায় চর্বি জাতীয় ভেজাল দেওয়া হয়) ।

এবার বলি মাখনে ভেজাল কেমন করে বোঝা যায় । মাখন দু রকমের দেখা যায় হলুদ ও সাদা । হলুদ মাখনটা খানিকটা গলিয়ে নিলাম টেষ্ট টিউবে । তারপর গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড ঢাললাম । অ্যাসিডটা টেষ্ট টিউবের একদম তলায় চলে যাবে এবং দেখা যাবে অ্যাসিড ও মাখনের সংযোগস্থলে সাদা সাদা ফেনা জমা হচ্ছে। আসলে ফেনাটা আসে পচা কলাকে ফেটিয়ে একরকম ফেনা তৈরী হয়। এইগুলোই ভেজাল হিসাবে ব্যবহার করা হয় । আসিডের রং হলো হলদে ।

সৎসঙ্গ আশ্রম, গিধনী, মেদিনীপুর

শব্দ ও বিত্ত

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

মিলন আজ আর স্কুলে যাবে না। কালরাতে কুটুকাকু মিলনদের নতুন কেনা ফ্ল্যাটে পা দিতেই কানে কানে কথা বলে সে স্কুলে না যাওয়ার ব্যাপারটা মার কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে। কুটুকাকু এসেই কথা দিয়েছেন, তিনি মিলনকে একটা ফুটবল কিনে দেবেন। ফুটবল কেনার উত্তেজনায় সে গতরাত্রে ভালো করে ঘুমুতেও পারে নি।

বিছানায় বসে কুটুকাকু খবরের কাগজ পড়ছেন। মিলনের উস্‌খুস্‌ ভাব। তার একটাই চিন্তা, কখন সে কুটুকাকুকে নিয়ে ফুটবল কিনতে যাবে। চা জলখাবার খাওয়া হয়ে গেছে। একটু আগে বাবা অফিস চলে গেলেন। ওখানেই উনি ভাত খেয়ে নেন। মিলনের আর তর্‌ সইছে না। অথচ কুটুকাকু ক্রমশঃ খবরের কাগজের মধ্যে ডুবে যাচ্ছেন।

কুটুকাকু মিলনের আপন কাকু নয়। বাবার ছোট-বেলার বন্ধু। কুটুকাকুর অনেক টাকা। বাবা প্রায়ই স্মরণ করিয়ে দেন, কুটু টাকা না দিলে তাঁর পক্ষে এ ফ্ল্যাট কেনা সম্ভব হত না। বরাবর মিলন যা চায়, কুটুকাকু তাই কিনে দেন।

কুটুকাকু মাছের ব্যবসা করেন। বাবার কাছেই মিলন এ'কথা শুনেছে। তবে মাছের ব্যবসা মানে বাজারে বসে মাছ বিক্রী নয়। উনি মাছের চাষ করেন। ছোট ছোট মাছ জলে ছেড়ে, বড় হওয়ার পর, কুটুকাকু সেগুলি ধরে মাছের কারবারীদের কাছে চালান দেন। বাবা বলছিলেন, পাঁচ পয়সার মাছ নাকি অনেক সময় ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে, পাঁচশো টাকা এনে দেয়। কুটুকাকু বিত্তবান হয়েছেন নাকি এইভাবে।

মিলনের এখন আর সময় কাটতে চাইছে না। সে শুধু ভাবছে, কখন কুটুকাকুর খবরের কাগজ পড়া শেষ হবে। ফুটবলটি কিনে না আনা পর্যন্ত শান্তি নেই। অথচ কুটুকাকুকে তাড়া দিতেও লজ্জা করছে।

মিলনের হঠাৎ রেডিওতে কান গেল। রেডিওতে এক ভদ্রলোক শব্দের অপকারিতা সম্পর্কে একটি কথিকা বলছিলেন। বিজ্ঞান স্যারের কথা মিলনের মনে পড়ল। বিজ্ঞান স্যার কালই বলছিলেন, "রেডিওতে বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রায়ই আলোচনা হয়; তোমরা সুযোগ পেলে সেগুলি শুনবে।"

মিলন রেডিওটা একটু জোরে করে দিল। ভদ্রলোক বলে চলেছেন, "শব্দ মানুষের যে কত ক্ষতি করতে পারে, তার ইয়ত্তা নেই।"...

কুটুকাকু আচমকা খবরের কাগজটা রেখে বিছানা থেকে উঠে এসে রেডিওটা বন্ধ করে দিলেন। কুটুকাকুর আচরণে মিলন খুব বিস্মিত হল। মিলন ক্ষোভের সঙ্গে বলল, "বারে, আমি শুনছিলুম।" কুটুকাকু বললেন, "এ'সব শুনে কী হবে? শব্দ সম্বন্ধে লোকটা কিছুই জানে না। শব্দ কী শুধু ক্ষতিই করে? উপকার করে না?" মিলন নির্বাক হয়ে কুটুকাকুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কুটুকাকু এবার হেসে বললেন, "শব্দই আমার ভাগ্য ফিরিয়েছে।"

"আপনি তো মাছ চাষ করেন?" মিলন প্রশ্ন করে। কুটুকাকু উত্তর দেন, "সব জায়গায় মাছ চাষ করলে বড় লোক হওয়া যায় না। নির্জন জায়গায় মাছ বড় হতে সময় নেয়। শব্দময় স্থানে মাছ তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠে। মাছের ওজন বাড়লে তবেই না মাছ বিক্রী করে লাভ।"

কুটুকাকু আরো জানালেন, প্রথমে তিনি মাছ চাষে সুবিধা করতে পারেন নি। কিন্তু রেললাইনের ধারে জলাশয় জমা নিয়ে মাছ চাষ করে তবেই তিনি বড়লোক হয়েছেন।

কুটুকাকু হাই তুলে একটা বালিশ কোলে তুলে নিয়ে মিলনকে বললেন, "ছোটাছুটি করে তোরা যেমন বেড়ে উঠিস, মাছও দৌড়াদৌড়িতে হাড়ে মাসে পুষ্ট হয়। কিন্তু মাছের সঙ্গে তোদের তফাৎ হচ্ছে, তোদের বয়সী ছেলে মেয়েরা সব সময় খেলতে ছুটতে চায়। কিন্তু মাছরা তা চায় না। ওরা সবাই গদাই লস্করি চালে চলতে চায়। খুব দ্রুত চলাফেরা ওদের পছন্দ নয়। তাই ওদের ছোটাতে হয়।" কুটুকাকু একটু দম নিয়ে আবার বললেন, "বুঝলি মিলন, মাছকে তো চীৎকার করে, টিন পিটিয়ে ছোটানো যায় না। কিন্তু ট্রেনের ঘর্‌ঘর্‌ আওয়াজে ওরা প্রাণভয়ে ছুটতে থাকে।

আমি যে জলাশয়ে এখন মাছ চাষ করি, তার পাশ দিয়ে শিয়ালদহ সেক্‌শানের পঞ্চাশ জোড়া আপ ডাউন ট্রেন রোজ বিকট শব্দ তুলে যাতায়াত করে। এর ওপর আছে বহু মালগাড়ী। এই বিরাট সংখ্যক ট্রেনের শব্দ আমার মাছগুলিকে অবিরাম ছুটিয়ে চলেছে।"

এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা বলে কুটুকাকা থামলেন। মিলন এবার বুঝতে পারল শব্দের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রচারের জন্যে কুটুকাকু কেন চটে গিয়ে রেডিও বন্ধ করেছিলেন। দেওয়াই স্বাভাবিক।

মিলন বুঝল শব্দ বিরক্তিকর হলেও, কানে তালা লাগানো ট্রেনের বিরামহীন শব্দ কুটুকাকুর মাছগুলির ক্রমাগত ওজন বৃদ্ধি করে। বিনি পয়সার শব্দ কুটুকাকুর ঘরে লক্ষ্মীকে বেঁধে রেখেছে।

102/C2/5 বি, টি, রোড, কলিকাতা-35

আশীষব্রত ঘোষ

রাত তখন প্রায় দশটা। কারখানা থেকে ফিরতে দেরি হয়ে গেল অনিমেষের। ওর সবল দেহটা নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চললো বাড়ির দিকে।

বুড়োশিবতলার মোড়ে এসে, মন্দিরের সামনে বারান্দাতে মাথা ঠেকানো লোকেদের পাশ কাটিয়ে পাশের গলি ধরলো। রাস্তাটা জনমানবশূন্য। উপরন্তু লোডশেডিঙের প্রকোপে চতুর্দিকের বাড়ি অন্ধকার। ভাগ্যে আকাশে ফুট-ফুটে চাঁদ, ঝলমলে জ্যোৎস্নার আলোতে তবু চলা যাচ্ছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে, ভ্যাপ্‌সা গরমের জন্যে বুকের বোতামগুলো নাভি পর্যন্ত খুলে গলির গোলকধাঁধা দিয়ে এগিয়ে চললো।

হঠাৎ মনে হলো সামনে গলির মোড়ে একটা সাদা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। অনিমেষ বিশেষ পাত্তা না দিয়ে সোজা এগোল। কিছুটা গিয়ে আরেক মোড়েও সেই মূর্তিটাকে দেখতে পেল। ও খুব অবাক হয়ে টর্চটা জ্বাললো। জ্বালতেই সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল। আশ্চর্য! ভেল্‌কি নাকি! ছোট্ট বয়স থেকে অনিমেষের ভয়টা কম। বন্ধুদের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে সে শ্মশানেও রাত কাটিয়েছে। অবাক হয়ে টর্চটা নেভাতেই আবার সেই মূর্তি তবে বেশ হাল্‌কা। এবার মনস্থির করে সমগ্র শক্তি সঞ্চয় করে ছুটে গেল সেটার দিকে। কিন্তু, ধরা দেওয়া তো দূরঅস্ত, সমানতালে সেটা ছুটতে লাগল। অনিমেষও মরিয়া হয়ে উঠেছে, বেশ একটা চোর-পুলিশ খেলা জমে উঠলো। তারপর, হারান মুখুজ্যের আমবাগানের পাশে পাকুড়তলায় এসে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। ওর মতো সাহসীরও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। কোনো রকমে বাড়ি ফিরে এসে একটু খেয়েই বিছানা নিল। তার মনে বার বার একটা প্রশ্নই উঁকি দিতে লাগলো—যে ছায়ামূর্তিটা সে দেখলো সেটা কি ভূত? অশরীরী? এইভাবে কিছুক্ষণ যেতেই ক্লান্ত দেহ ঘুমে কাতর হয়ে পড়লো।

* * *

পরদিন সকালেই কোনরকমে চা-পাঁউরুটি খেয়ে বেরুলো বাড়ি থেকে। গতকালের ঘটনার উত্তর খুঁজতে। প্রায় দৌড়েই এলো প্রফেসর তিলক প্রামানিকের বাড়ি।

তিলকবাবু অনিমেষের 'প্রোফেসর কাকা', তার বাবার বন্ধু। উনি ফিজিক্সে ডক্টরেট। বর্তমানে 'আলোক-বিজ্ঞান'-এর উপর রিসার্চ করছেন। ব্যাচেলার, আত্মভোলা মানুষ।

দরজায় নক্ করতেই ট্রাউজার ও গেঞ্জি পরিহিত প্রোফেসর প্রামানিক মুখ বাড়ালেন।—

'আরে আরে অনি যে! এসো এসো।' বলে অনিমেষের কাঁধে হাত রেখে গোদা গোদা বইয়ে ঠাসা ড্রইংরুমে এনে বসালেন।

—"তারপর? বল—কি হেতু আগমন তব?"

অনিমেষ আম্‌তা আম্‌তা করে বললো—"ব্যাপারটা আপনার পক্ষে হাস্যোদ্দীপক হতে পারে, অবিশ্বাস্য হতে পারে; কিন্তু আমি সত্যিই দেখেছি।"

—"আহা, কি দেখেছ বলবে তো!"

—"বিশ্বাস করবেন তো?"

—"নিশ্চয়ই করব, বল।"

ভরসা পেয়ে গতরাত্রের সমস্ত ব্যাপারটা অনিমেষ খুলে বললো।

সব শুনে প্রফেসর প্রামানিক গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর অস্ফুটভাবে বলতে শুরু করলেন—"কাল বেশ গরম ছিল, না? হুম্, জ্যোৎস্নাও ছিল।"...

বলেই হোঃ হোঃ করে অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন।

—'আরে! এতে হাসির কি পেলেন? ব্যাপার কি?'

—'ব্যাপার আলোক বিজ্ঞান।'

—'মানে?'

—'মানে? মানে হলো 'শহুরে মরীচিকা'। অর্থাৎ, —ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিই শোনো। এটা স্রেফ আলোর প্রতিসরণের ব্যাপার। জলে একটা লাঠি ডোবালে, তার ডোবা অংশ বাঁকা দেখায়। কারণ, জল ও বায়ুর ঘনত্ব আলাদা। এই তারতম্যের জন্যে আলো বেঁকাভাবে চোখে পড়ে, এবং বস্তু বাঁকা দেখায়। সেরকম গরমকালে মাটি ও তৎসংলগ্ন বায়ু গরম হয় এবং অপেক্ষাকৃত উপরের ঠাণ্ডা বায়ুর থেকে এর ঘনত্ব কম হয়। তাই, জ্যোৎস্না রাতে চাঁদের আলো পড়ার সময় এই তারতম্যের জন্যে তির্যকভাবে পড়ে এবং এই তির্যক রশ্মিগুলি আশপাশের আলো থেকে পৃথকভাবে দেখা যায়। সেটাই তুমি ছায়া-মূর্তি বা ভূত ভেবেছিলে। টর্চ মারলে তো তার উজ্জ্বলতর আলোয় কিছুই দেখা যাবে না। অবশ্য এরকম দৃশ্য খুব বেশি দেখা যায় না। বুঝলে? সবের মূলে সেই আলোক বিজ্ঞান—যা তোমাকেও ভড়কে দিয়েছিল। হাঃ হাঃ।'—ঝাড়া একটানা এই কথাগুলো বলে থামলেন প্রফেসর প্রামানিক।

হতভম্ব অনিমেষ ধাতস্থ হয়ে বললে, 'ধন্যি আপনার এই আলোক-বিজ্ঞান!'

রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল, বরাহনগর

কিঞ্চিৎ হলেও নিশ্চিত

আশিস দাস

দার্জিলিং, কালিম্পং কার্শিয়াং-এর নাম শুনলেই আইস-ক্রিমের মতো হিমালয়. ঘন সবুজ পাহাড়, পাইনগাছ আর ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। পাহাড়ী ঝর্ণার নৃত্যের তালে তালে ফর্সা, বেঁটেখাটো পাহাড়ী অধিবাসীদের দলবদ্ধ নৃত্য দেখা এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। ঠিক মনে হবে সবুজ গাছগাছালি মেঘ আকাশ, নদী, পাহাড়ে ঘেরা একদল নৃত্যরত মানুষের জলছবি। এর মধ্যে দু'-একটা লোককে তোমাদের কেমন যেন একটু অদ্ভুত মনে হয়েছে তাই না ? ওদের মধ্যে দু'একটা লোকের গলার কাছটা কেমন যেন অস্বাভাবিক রকম ফোলা। ওই অস্বাভাবিকতা একটা রোগ। ঐ রোগের নাম গলগণ্ড বা গয়টার। আমাদের শরীরে একটি ট্রেস এলিমেন্টের অভাবের জন্যে ওই রোগ হয়। এই ট্রেসএলিমেন্ট কথাটা একটু বোঝা দরকার।

তোমরা জানো উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর জীবনধারণের জন্যে খাদ্য একান্তই প্রয়োজন। এই খাদ্য জীবদেহে শক্তি জোগায়, দেহ গঠনে অংশ নেয় এবং দেহের যাবতীয় স্বাভাবিক কাজকর্ম বজায় রাখে। জীবের খাদ্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট এবং ভিটামিন, খনিজ লবণ ও জল। খাদ্যের এই ভাগগুলির সঙ্গে আমরা প্রায় সবাই পরিচিত। এরা ছাড়াও আমাদের জীবনধারণের জন্যে অল্প পরিমাণে বেশ কিছু মৌলের প্রয়োজন হয়। এই সমস্ত মৌলকে ট্রেস এলিমেন্ট বা লেশ মৌল বলে। আয়োডিন, লোহা তামা, ফ্লোরিন, ম্যাংগানিজ দস্তা, অ্যালুমিনিয়াম, মলিবডেনাম কোবাল্ট এই ট্রেস এলিমেন্টের অন্তর্ভুক্ত। সবচেয়ে মজার ব্যাপার আমাদের শরীরে এদের প্রয়োজন কিঞ্চিৎ হলেও, সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্যে এরা একান্ত অপরিহার্য। শরীরে এদের পরিমাণ কমে গেলে বা বেড়ে গেলে আমরা নানা রোগের দ্বারা আক্রান্ত হই। দার্জিলিং কালিম্পং আর কার্শিয়াং-এ দেখা পাহাড়ী অধিবাসীদের ঐ গলা ফোলার কারণ কি ?

উত্তর এবং পূর্বভারতের পাহাড়ী অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে গলগণ্ড বা গয়টার রোগের কারণ হচ্ছে, ঐ সমস্ত এলাকায় মানবদেহের প্রয়োজনীয় ট্রেস এলিমেন্ট আয়োডিনের অভাব। শারীরতত্ত্ববিদেরা লক্ষ্য করেছেন যে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যত উচ্চতা বাড়বে তত ঐ সব স্থানে আয়োডিনের অভাব ঘটবে। আর তার ফলেই দেখা দেয় ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের গলগণ্ড বা গয়টার রোগ।

এখন জানতে ইচ্ছা করছে আয়োডিন, শরীরে কিভাবে কাজ করে। এর অভাব হলেই বা গলগণ্ড রোগ কেন হয় ?

আমাদের গলার মাঝখানে ল্যারিংসের সামনে একটা গ্রন্থি আছে যার নাম থাইরয়েড। ঐ গ্রন্থি প্রধানত থাইরক্সিন ও ট্রাই-আয়োডোথাইরোনিন নামে দুটি হর্মোন নিঃসৃত করে। হর্মোন হচ্ছে একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থে সৃষ্ট অন্তঃক্ষরণ, যা রক্তস্রোত বা অন্য কোন দেহরসের মাধ্যমে দেহের বিশেষ বিশেষ স্থানে উপস্থিত হয়ে সেই স্থানকে সক্রিয় করে তোলে। এর প্রভাবেই দেহের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ উদ্দীপ্ত ও প্রশমিত হয়। আর এই থাইরক্সিন হর্মোনের অণুতে আবার চারটি আয়োডিনের পরমাণু থাকে। এর ফলে খাদ্যে আয়োডিনের অভাব ঘটলে ঐ থাইরয়েড হর্মোনের ক্ষরণ কমে যায়। ফলে মস্তিষ্কের মধ্যে পিটুইটারী গ্রন্থি থেকে থাইরয়েড উদ্দীপক হর্মোন, থাইরোট্রফিক হর্মোনের ক্ষরণ বাড়ে। ফলে থাইরয়েডের আয়তন বেড়ে গলগণ্ড বা গয়টার রোগ হয়। থাইরক্সিন ও ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন হর্মোন আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ, যেমন অস্থি, পেশী এবং মস্তিষ্কের বৃদ্ধির জন্যে একান্ত প্রয়োজন। শৈশব অবস্থায় থাইরয়েড গ্রন্থির স্বাভাবিক কাজ কমে গেলে শরীরে থাইরক্সিনের অভাব ঘটে ! ফলে বয়স বাড়লেও ভবিষ্যতে কিশোর বা কিশোরীটি জড় বা স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন হয়। শিশু অবস্থায় কথা বলা, হাঁটা প্রভৃতি দেরিতে হয়।

শরীরে আয়োডিনের অভাব ঘটলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। তিনি তখন আমাদের দৈনিক খাদ্যে যে নুন খাই তার সঙ্গে আয়োডাইড মিশিয়ে খেতে নির্দেশ দেন। আমাদের জানা উচিত কোন্ কোন্ খাদ্যে আয়োডিনের পরিমাণ বেশি থাকে। যেমন কড্ ও অন্যান্য সামুদ্রিক মাছ এবং তাদের তেল, শামুক, গুগলি ও পেঁয়াজ। এইসব খাদ্য আয়োডিনের অভাব দুর করে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের থেকেও কিন্তু তোমাদের আয়োডিনের প্রয়োজন বেশি। তোমাদের প্রত্যেকদিনের খাদ্যে 150 মাইক্রোগ্রাম আয়োডিন প্রয়োজন আর পূর্ণবয়স্ক পুরুষের প্রয়োজন 140 মাইক্রোগ্রাম। মনে রাখবে খেলতে খেলতে কেটে, ছড়ে গেলে যে আয়োডিন লাগানো হয়, তা কিন্তু কোনদিন খাবার চেষ্টা করবে না। তা হলেই সমূহ বিপদ !

1B, মোহনলাল স্ট্রীট, কলিকাতা-4

হুলো নিখোঁজ

রাখাল বিশ্বাস

কাজল কালো দুইটি চোখের কোণ
কালো হুলো দারুণ সে উনমন।
চলতে গেলে ছন্দ বাজে লেজে
বন্দী করে রাখলো তাকে কে যে ?
কপালে তার একটি কাটা দাগ
যখন তখন নেই মোটে তার রাগ।
মারলে খোঁচা বলবে ডেকে মিঁয়াও
এখন আমার নেই যে সময় কিঁয়াও ?
চারটি পায়ের দুইটি ছোট তার
লম্বা কানের রঙ কি চমৎকার।
সেই সে হুলো ভোরবেলাতে উঠে
চাঁদের দেশের সমুদ্রে যায় ছুটে।
এক জোড়া মাছ আনবে বলে তাই
চমকে যাবে সকলে, সব্বাই।
তারপরে তার খোঁজ মেলে নি জানি
শহর জুড়ে তাই তো কানাকানি।
কেউ যদি পাও পৌঁছে দিও তাকে
লাল বাজারের রান্নাঘরের তাকে ॥

32, গ্রীন পার্ক, কলিকাতা-56

ছবি : অহিভূষণ মালিক

আপনি নিশ্চয় প্রস্তুত?
হ্যাঁ ক্যাপ্টেন, আমি তৈরী।
পরের দিন... ভোর চারটে।
দিগন্তরেখায় তখনো রাতের অন্ধকার। নিমো তাঁর সাথীদের নিয়ে এগিয়ে চললেন।
গৌতম কর্মকার
ক্যাপ্টেনের নির্দেশে নোঙর ফেলা হল।
আমরা এসে পড়েছি মঁসিয়ে অ্যারোনেক্স। এবার ডুবুরীর পোষাক পরে তৈরী হোন।
প্রত্যেকে একটা করে ছুরি নিন। জলের নীচে বন্দুকের প্রয়োজন নেই।
এই হারপুন বীরের কাছে একটা হারপুন কিন্তু সব সময় থাকবে।
ডুবুরীর পোষাক পরে একে একে সকলেই হারিয়ে গেলেন অতল জলের গভীরে।
সমুদ্রতলের বিস্তীর্ণ নুড়ি পাথরের রাজ্য সকালের আলোয় ঝলমল করছে। মনে মনে বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করলেন অধ্যাপক।
হঠাৎ ক্যাপ্টেন ইশারায় সকলকে লুকিয়ে পড়তে বললেন।
হাঙর?
জলের ভিতর এবার দেখা গেল একটি মনুষ্যমূর্তি...
মুক্তো সন্ধানী।

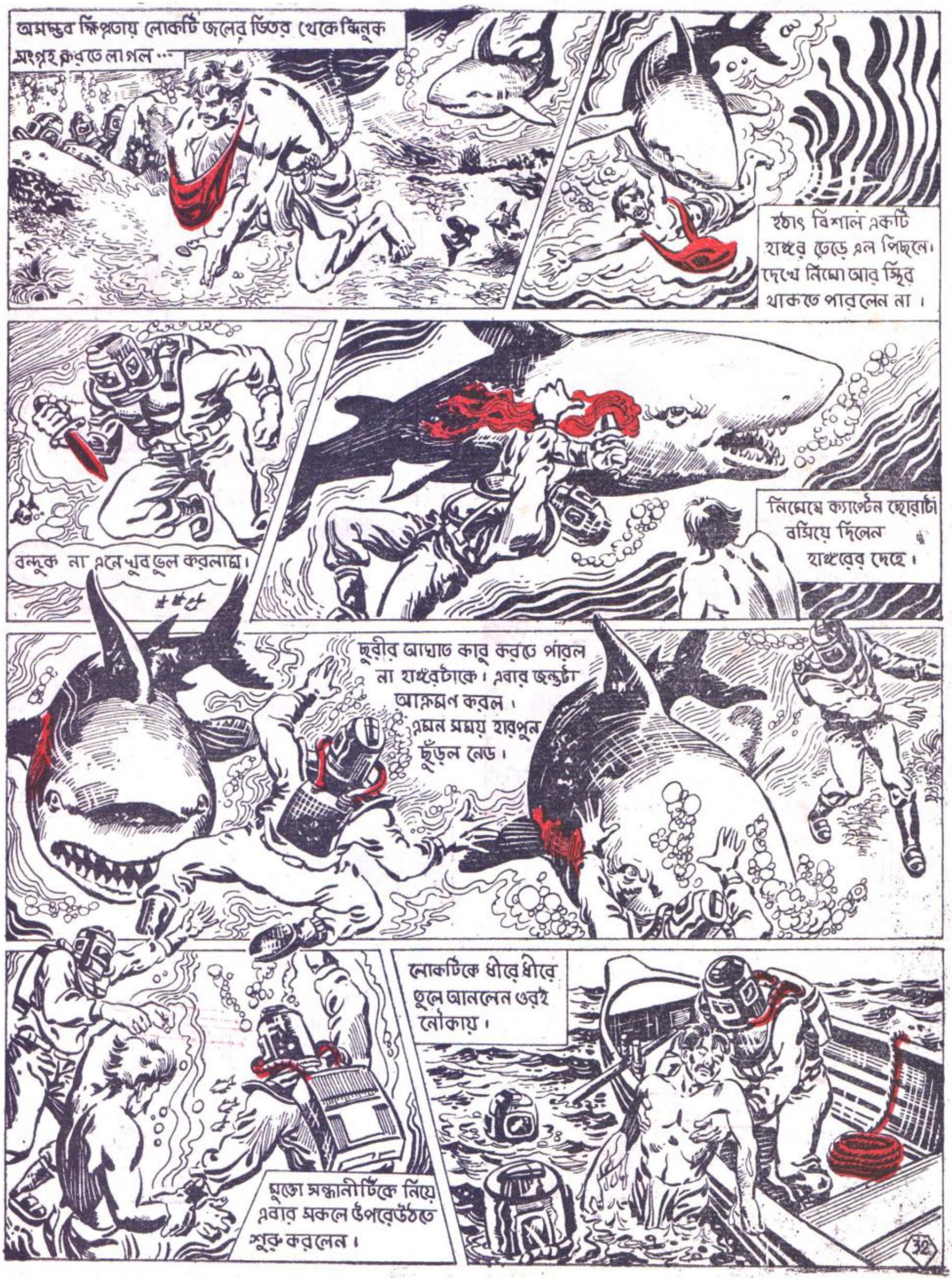
অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় লোকটি জলের ভিতর থেকে ঝিনুক সংগ্রহ করতে লাগল ...
হঠাৎ বিশাল একটি হাঙ্গর তেড়ে এল পিছনে। দেখে নিমো আর স্থির থাকতে পারলেন না।
বন্দুক না এনে খুব ভুল করলাম।
নিমেষে ক্যাপ্টেন ছোরাটা বসিয়ে দিলেন হাঙ্গরের দেহে।
ছুরীর আঘাত কাবু করতে পারল না হাঙ্গরটাকে। এবার জন্তুটা আক্রমণ করল। এমন সময় হারপুন ছুঁড়ল নেড।
মুক্তো সন্ধানীটিকে নিয়ে এবার সকলে উপরে উঠতে শুরু করলেন।
লোকটিকে ধীরে ধীরে তুলে আনলেন ওরই নৌকায়।
32

হাবুলের বিজ্ঞান-ভাবনা
ধীরেন বল
সন্ধ্যা হয়েছে, অন্ধকারে বসে কী গল্প চলছে?
সন্ধ্যাতারা কি জ্বলবেনা?
সন্ধ্যাতারা ত এখন আর ওঠেনা!
ওঃ! তাহলে বলতে আমার ভুলই হয়েছে!
ওমা! সন্ধ্যাতারা আর ওঠেনা? কোথায় গেলো তবে?
নাম পাল্টালো।
আদালতে এফিডেভিট করে নাকি? যাঃ!
নাম পাল্টিয়েছি আমরা। ও শুধু স্থান পাল্টেছে।
সেটা কী রকম?
সূর্যের দ্বিতীয় গ্রহ শুক্র। সে এতদিন তার পূব দিকে ছিল, প্রদক্ষিণ করে এবার সে তার পশ্চিমে গিয়েছে।
এখন সূর্যোদয়ের আগে সে পূব আকাশে দেখা দেয়, নাম হয়েছে শুকতারা বা ভোরের তারা।
ওমা! তাই নাকি? দুটো তারা তবে এক?
যত দিন সূর্যের পূর্বদিকে ছিল সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে দেখা যেত। আমরা বলি সন্ধ্যাতারা। আসলে ওটা শুক্রগ্রহই।
ভারী মজার ত।

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের ১২২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে
আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

তথ্য ও সংস্কৃতি ৪০১১/৮৩

R/No 37390/81 KISHORE JAN-BIJNAN 3rd year, June 1983 Regd No WBCC/50

ছোটদের জন্য বই একশ বই

কিশোর ক্ল্যাসিক্‌স্‌

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ তেপান্তর—২০·০০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কিশোর অপু—২০·০০
অপুর ছেলেবেলা,—১০·০০
ছোটদের অপরাজিত—১০·০০
তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ছোটদের কাজল—১০·০০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥
ছোটদের সন্দীপন পাঠশালা—৮·০০
বুদ্ধদেব বসু ॥ অপরূপ রূপকথা—১০·০০
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ বাংলার ডাকাত ১-৪—৩২·০০
মহিম ডাকাত—১০ ০০
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ ঘনাদা বিচিত্রা—২০·০০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ টেনিদার অভিযান—২০·০০

ভ্রমণ ও অভিযান

ধীরেন্দ্রলাল ধর ॥ দুরন্ত যাত্রী—৮·০০
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ॥ গঙ্গা যমুনা—৮·০০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥
সুন্দরবনে সাত বৎসর ৮ ০০
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ॥ আমাজনের অরণ্যে—৮ ০০
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ নীল তিমি—৮·০০
শিশির ঘোষ ॥ লাঙ্গুলসিংহের সন্ধানে—৬·০০

রহস্য, রোমাঞ্চ, ভৌতিক গল্প

হেমেন্দ্র কুমার রায় ॥ ভৌতিক গল্প—১০·০০
মোহনপুরের শ্মশান-৫ ০০ যক্ষপতির রত্নপুরী-৬·০০
স্যার আর্থার কোনান ডয়েল ॥
কিশোর রহস্য গল্প—৮·০০
কিশোর রোমাঞ্চ গল্প—৮·০০
কিশোর গোয়েন্দা গল্প—১০·০০
দীনেন্দ্রকুমার রায় ॥ যখের আসন—৮·০০
আনন্দ বাগচী ॥ মুখোশের মুখ—৮·০০

ছবি ও ছড়া

যোগীন্দ্রনাথ সরকার ॥ খুকুমণির ছড়া—১০·০০
অন্নদাশঙ্কর রায় ॥ হট্টমালার দেশে—৫·০০

সচিত্র জ্ঞানবিজ্ঞান

অমরনাথ রায় ॥ সংখ্যা নিয়ে খেলা—৮·০০
জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজার খেলা—৫·০০
সায়েন্স ক্যুইজ—১০ ০০
সমরজিৎ কর ॥ নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী—১৫·০০
সমুদ্রের সম্পদ—৮·০০
স্বপন বুড়ো ॥ বুক অব নলেজ—১০·০০
অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ রোবোট এল কেমন করে?
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥
বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার—৬·০০
সিদ্ধার্থ ঘোষ ॥
স্যাম লয়েড ও ল্যুইস ক্যারোলের ধাঁধা—১০·০০
অঙ্কের ম্যাজিক খেলার লজিক ৬·০০

পশুপাখি বনজঙ্গলের গল্প

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ পশুপাখী কীটপতঙ্গ—৮·০০
যোগীন্দ্রনাথ সরকার ॥ পশুপক্ষী—২০·০০
বনে জঙ্গলে ২০·০০
অজয় হোম ॥ বাংলার পাখি—২০·০০
অমিতাভ চক্রবর্তী ॥ ছোটদের বাঘের গল্প—৮.০০
কেনেথ আণ্ডারসন ॥ বাঘের গর্জন—১৫·০০
মানুষখেকোর বিভীষিকা—১৫·০০

ফ্যাণ্টাসী ও মজার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা—৮·০০
ঘনাদার জুড়ি নেই—৮ ০০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ চারমূর্তি—৮ ০০
ঝাউবাংলোর রহস্য—৮·০০ কম্বল নিরুদ্দেশ—৬·০০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ হাতিচোর—৮·০০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প ৮ ০০
রামধনু ১০·০০ ছোটদের মজার গল্প—৬·০০

বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞানের গল্প

লীলা মজুমদার ॥ কল্প-বিজ্ঞানের গল্প—১৫·০০
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ লুপ্তধন—৮·০০
তুষারলোকের রহস্য—৮·০০ মেঘনাদ—১০·০০
অদ্রীশ বর্দ্ধন ॥ কিশোর সায়েন্স ফিকশ্যান—১৫ ০০

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য লিখুন

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—৭৩

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩ হইতে প্রকাশিত এবং ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা ৬, তাপসী প্রিণ্টার্স হইতে মুদ্রিত। দাম দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।
প্রচ্ছদ মুদ্রণ : লক্ষ্মীনারায়ণ প্রসেস ১৯ গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলি-৬